ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 16, No. 1, June 2019

S R Lahiri Mahavidyalaya, Majdia
University of Kalyani
West Bengal

ISSN: 2249-4332

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas
Volume 16, No. 1, June 2019

'Open Eyes' is a multidisciplinary **peer reviewed journal** published biannually in June and December since 2003. It is published by the Principal, Sudhiranjan Lahiri Mahavidyalaya, Majdia, University of Kalyani, West Bengal, India on behalf of the Seminar & Research Forum. Contributed original articles relating to Social Science, Literature, Commerce and Allied Areas are considered for publication by the Editorial Board after peer reviews. The authors alone will remain responsible for the views expressed in their articles. They will have to follow styles mentioned in the 'information to the contributors' given in the inner leaf of the back cover page of this journal or in the website. All editorial correspondence and articles for publication may kindly be sent to the Executive Editor(s).

Advisory & Editorial Board

Professor (Dr.) Barun Kumar Chakroborty
Emeritus Professor, Rabindra Bharati University, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Samir Dasgupta
Department of Sociology, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Tapas Basu
Department of Bengali, University of Kalyani, West Bengal, India.

Professor (Dr.) Apurba Kumar Chattopadhyay
Department of Economics & Politics, Visva-Bharati (A Central University), West Bengal, India.

Professor (Dr.) Jadab Kumar Das
Department of Commerce, University of Calcutta, Kolkata, India.

Professor (Dr.) Md. Mizanur Rahman
Department of Emglish, Islamic University, Kushtia, Bangladesh.

Dr. Biswajit Mohapatra
Department of Political Science, North Eastern Hill University, Shillong, Meghalaya, India.

Dr. Paramita Saha
Department of Economics, Tripura University (A Central University), Tripura.

Dr. Prasad Serasinghe
Department of Economics, Faculty of Arts, University of Colombo, Sri Lanka.

Jt. Editor

Dr. Bhabesh Majumdar
(bhabesh70@rediffmail.com)

Shubhaiyu Chakraborty
(shubhaiyu007@gmail.com)

Contents

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ
ড. উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল ৩

নির্মাণ-বিনির্মাণ : জীবনানন্দের ছোটগল্প
ড. মাধুরী বিশ্বাস ১৩

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প : বয়ঃসন্ধিক্ষণ
ড. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায় ২৫

পূর্ব ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহ ও ইতিহাস চর্চা
ড. শান্তনু গোলুই ৩৬

Lac Production in India : A Study
Dr. Malay Kumar Ghosh 43

MGNREGA and Awareness Indicator of Empowerment : A Case Study
Arindam Chakraborty 49

দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ

ড. উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল

বাংলা নাট্যজগতে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের আবির্ভাব যেন যুগের প্রয়োজনেই ঘটেছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের মধ্যেই নাট্যসাহিত্যের আধুনিক যুগের সকল বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ পেয়েছে। রচনার আঙ্গিক ভাষা ও ভাবের দিক থেকে তিনি বাংলা নাটকের মধ্যে সম্পূর্ণ নূতনত্বের সৃষ্টি করেছেন, বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যযুগের ধারার সঙ্গে তিনিই সুস্পষ্ট বিচ্ছেদ স্থাপন করলেন। যে সকল নাটকের ভিতর দিয়ে তাঁর মৌলিক প্রতিভার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পেয়েছে, তা বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে রচিত হয়েছিল। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর এই যুগের কোন রচনায় পূর্ববর্তী যুগের সঙ্গে যোগ রক্ষা করতে যাননি, অতএব বাংলা নাট্যসাহিত্যে আধুনিক যুগ সুস্পষ্টভাবে তাঁকে অবলম্বন করেই সূত্রপাত হয়েছিল বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। পাশ্চাত্য নাটকের প্রাণসত্তা বলিষ্ঠরূপে দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে প্রকাশিত হয়। তিনি নাটকের প্রত্যক্ষ প্রেরণা খাস বিলেতের মাটিতে পেয়েছিলেন।[১] তিনি যখন দেশে ফিরলেন তখন ইংরেজের ভাব আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গি তাঁর জীবনকে ভরে রেখেছিল শুধু কেবল আহার-বিহারে নয়, কাব্যে গানেও তিনি ইংরেজদের জগতের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পাশ্চাত্যের প্রতি এতখানি আনুগত্য থাকা সত্ত্বেও এই পাশ্চাত্য সমাজ ও রাষ্ট্রের সঙ্গে পরিচয়ের ফলেই তাঁর মধ্যে জাতীয় ভাব উন্মেষিত হয়েছিল। তৎকালীন সমাজের দিকে তাকিয়ে তিনি দেখলেন সেখানে রয়েছে এক সর্বব্যাপী ক্লীবত্ব। একদিকে পুরাতনের প্রতি তামসিক মোহ, অন্যদিকে সংস্কারের নামে স্বেচ্ছাচার আর জাতীয়তা কৃত্রিম ও কপট অভিনয় এই মোহ ও বিকৃতিকে তিনি আঘাত করলেন। কিন্তু সেই আঘাতের পিছনে ছিল হিতৈষী মনের সুগভীর মর্মবেদনা।[২] তাঁর বলিষ্ঠ স্বদেশপ্রেম প্রকাশের পর্যাপ্ত ক্ষেত্র হল ঐতিহাসিক জগতে। সেখানকার বিচিত্র উত্থান-পতনময় কাহিনীর মধ্যে তিনি তাঁর উদাত্ত স্বদেশপ্রেম ঢেলে দিলেন। রাজপুত কাহিনী পরাধীন দেশের মুক্তিকামী জনগণের নিজেদের কাহিনী হয়ে উঠল। কিন্তু শুধু কেবল দেশপ্রেম নয়, জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে এক উদার সর্বজনীন প্রেমে দ্বিজেন্দ্রলালের চিত্ত অনুপ্রাণিত ছিল।[৩] সেজন্য উগ্র জাতি বৈরিতা অপেক্ষা মানবের সামগ্রিক কল্যাণ ও মৈত্রী স্থাপনে তাঁর আদর্শায়িত দৃষ্টি আগ্রহান্বিত ছিল।

নাটক পাঠ করা এবং দর্শনের মাধ্যমে ক্রমে ক্রমে দ্বিজেন্দ্রলালের মধ্যে নাট্যপ্রতিভা উন্মেষিত হয়। বিলেতে এবং এদেশে বহু নাটকের অভিনয় দেখে নাটকের প্রতি তাঁর আগ্রহ জন্মাতে থাকে। প্রসিদ্ধ নাট্যকারদের নাট্যাদর্শ অনুসরণ করে তিনি তাঁর নাটক রচনা আরম্ভ করেন। ক্রমশঃ তাঁর প্রতিভার বিচিত্র শতদল তাঁর রচনার মধ্য দিয়ে ক্রমে ক্রমে বিকশিত হয়ে ওঠে। বিংশতি শতাব্দীর প্রথম দশক ঐতিহাসিক নাটক রচনারই যুগ। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর রচনায় এই যুগ বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণরূপে অবলম্বন করেই যশোলাভ করেছেন। বাংলার সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের ভাবাদর্শ তাঁর নাটকের মতো আর কারোর নাটকে এমন তীব্র ও প্রত্যক্ষভাবে প্রকাশ পায়নি। সমসাময়িককালে দ্বিজেন্দ্রলালের ব্যাপক লোকপ্রিয়তাই হল এর অন্যতম কারণ। মূলতঃ নাট্যকাব্য রচনার ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের সমাজ সম্পর্কিত বিশিষ্ট মতবাদ গুলির প্রকাশ তখনও নিঃশেষ হয়নি, এমন সময় দেশে এক উত্তেজনাপূর্ণ আন্দোলনের সূত্রপাত হয় এবং তখন থেকে সেটাই অবলম্বন করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সমাজ ও রাষ্ট্র সম্পর্কিত মতবাদগুলি প্রচার করতে উদ্যোগী হন। এই আন্দোলনই বাংলার 'স্বদেশী আন্দোলন' নামে পরিচিত। ''স্বদেশীর সময় সভা সমিতিতে যোগ দিতাম বটে, কিন্তু কতকটা যন্ত্রচালিতের মতো। সকলে করিতেছে, গড্ডালিকা প্রবাহে আমিও করিতাম। বোধহয় শীঘ্রই ইহার মর্ম ভুলিয়া যাইতাম, যেমন অনেকে গিয়াছে। কিন্তু বাংলার রঙ্গমঞ্চ তাহা হইতে দেয় নাই।''[৪] এই বক্তব্যটির মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় স্বদেশী আন্দোলন সাহিত্য ও সমাজে কতটা প্রভাব বিস্তার করেছিল। শুধু তাই নয়, ইংল্যাণ্ডীয় দ্বৈপায়ন সংস্কৃতি ও প্রতীচ্য শিক্ষা বাঙালিয় দীর্ঘ

পাইক মণ্ডল, ড. উজ্জ্বলা : দ্বিজেন্দ্রলালের নাটকে স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবোধ

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 1, June 2019, Page : 3-12, ISSN 2249-4332

দিনের জড়চৈতন্যে আঘাত করে এবং তন্দ্রানুভূতিতে নবজাগৃতির বিস্ময় জাগিয়ে তোলে। স্বাধীনতাস্পৃহা, ধর্ম-সমাজ-সংস্কার আন্দোলনের মাধ্যমে দেশ ও জাতির মুক্ত অন্বেষণ সমস্ত কিছুতে এক বিরাট কর্মপ্রয়াস পরিব্যপ্ত হয়ে পড়ে। স্বাদেশিকতা চিন্তা জীবনের বীজমন্ত্র রূপে গৃহীত হয়।

যদিও ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে লর্ড কার্জন কর্তৃক বঙ্গবিচ্ছেদই এই আন্দোলনের জন্য মুখ্যত দায়ী, তথাপি এর বহু পূর্বে ১৮৬৭ খ্রিস্টাব্দে এদেশের কতিপয় স্বদেশানুরাগী উৎসাহী ব্যক্তি কর্তৃক 'স্বদেশী-মেলা'র প্রতিষ্ঠার পর থেকেই যে এদেশের শিক্ষিত সমাজে এক জাতীয়তাবোধের উন্মেষ ঘটেছিল, এই স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে তারই পূর্ণতম বিকাশ দেখা গিয়েছিল। এই সদ্য-প্রবর্তিত দেশাত্মবোধ আন্দোলনের প্রতি কোনরূপ আন্তরিক সহানুভূতির জন্যই যে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাট্যসাহিত্যে একে উপজীব্য করেছিলেন তা নয়, কেবল যুগ-প্রভাব দ্বিজেন্দ্রলালের শক্তিতে অনতিক্রম্য ছিল বলেই তাঁর সমসাময়িক নাট্য-রচনাগুলিকে এই ভাবের বাহন করে নিয়েছিলেন। এ কথা বলার অর্থ এই যে দ্বিজেন্দ্রলালের এই প্রেরণা তথাকথিত দেশাত্মবোধক নাট্যরচনাগুলির মধ্যে দিয়ে তার বিশিষ্ট সমাজ চৈতন্যেরই অভিব্যক্তি দেখা দিয়েছে। কুসংস্কার ও সঙ্কীর্ণ আচার-দুষ্টসমাজ যে কোনদিনই জাতীয় কল্যাণের অধিকারী হতে পারে না, তিনি এই কথাই বিশেষ করে এই নাটক গুলির মধ্যে বলতে চেয়েছেন, সমাজ ও ধর্মবোধ নিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদকে তাঁর কোন নাটকের মধ্যেই তিনি জয়মাল্য দিয়ে ভূষিত করেন নি। বিখ্যাত সাহিত্যিকের মন্তব্য ও প্রসঙ্গে এটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে, ''যে কথা তিনি তাঁহার 'একঘরে' নিবন্ধে প্রকাশ করিয়াছেন কিংবা যে কথা তিনি তাঁহার সামাজিক প্রহসন গুলির ভিতর দিয়া, এমন কি কোন কোন নাট্যকাব্য গুলির ভিতর দিয়াও বলিতে চাহিয়াছেন, তাহাই তিনি তাঁহার এই দেশাত্মবোধক নাট্যরচনাগুলির মধ্যে দিয়াও প্রচার করিয়াছেন। .... তাঁহার এই নাট্যরচনাগুলির মধ্যে দিয়া স্বদেশী আন্দোলনের মূল আদর্শ বা তাহার প্রকৃতি কিছুই ধরা পড়ে নাই। সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের দেশাত্মবোধক, তাঁহার বিশিষ্ট সামাজিক মতবাদ প্রকাশেরই অবলম্বন রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে মাত্র।''[৫] যাই হোক দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন-চরিত আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায় যে বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতিবাদ রূপে মুখ্যত স্বদেশী আন্দোলনের সৃষ্টি হয়েছিল সেই বঙ্গবিচ্ছেদের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের আন্তরিক সহানুভূতিই বর্তমান ছিল। দেশের আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা যে ব্যবস্থার প্রতিবাদ করছিল, স্বাধীনচেতা দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের বুদ্ধি ও বিবেক দ্বারা তার পরিণাম বিবেচনা করে তার পক্ষপাতিত্বই করেছিলেন। এ সম্পর্কে তাঁর জীবনচরিতকার লিখেছেন, ''মূলে, যে কারণে-দেশে এই আন্দোলন শুরু হইল, দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথম থেকেই তাহার এক রূপ পক্ষপাতই দেখাইতেছিলেন। গোটা দেশে সমস্ত লোক যে-সম্বন্ধে এতটা জেদের সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত, একা দ্বিজেন্দ্রলালকে সে-সম্বন্ধে এমন ভিন্ন মতাবলম্বী দেখিয়া খুবই আশ্চর্যান্বিত হইতে হয়; কিন্তু, যাঁহারা তাঁহাকে তেমন যাচাইয়া জানিতেন, তাঁহাদের পক্ষে ইহাতেও তত বিস্ময়-বোধের কারণ ছিল না।''[৬]

এই স্বদেশী আন্দোলনের সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলালের তেমন কোন প্রত্যক্ষ সম্বন্ধ ছিল না এবং এ'কথাও সত্য যে স্বদেশী-সভায় বক্তৃতা দিয়ে লোক মাতানোর জন্য দ্বিজেন্দ্রলাল কোন দিন আসরে নামেন নি। একথা বিশেষভাবে বলবার উদ্দেশ্য এই যে, কেউ কেউ মনে করেন, ''Dwijendralal Roy was deeply stirred by the Swadesi Movement, and for a time almost completely threw himself into it."[৭] বাঙালির এই নবপ্রবুদ্ধ জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে দ্বিজেন্দ্রলালের এই বিশ্বাস ছিল যে, "যতদিন আমাদের সামাজিক অনেক প্রথাই উঠিয়া না যায় অর্থাৎ সময়ানুরূপ সংস্কৃত না হয়, ততদিন আমাদের politically এক হওয়া অসম্ভব।''[৮] তাঁর স্বদেশপ্রেমমূলক নাটকগুলির মধ্যে তিনি এই কথাই বিশেষ করে বলতে চেয়েছেন, এর অতিরিক্ত তিনি আর কিছু চান নি।

গিরিশচন্দ্রের পর তিনিই বাংলা নাটকে স্বদেশপ্রেমের পুণ্যতোয়া প্রবাহিত করেন। এঁর নাটকগুলির পটভূমি ছিল বাঙালির স্বদেশী আন্দোলন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাদেশিকতার স্বরূপ ছিল মাতৃপূজা ও মাতৃসেবা। অহেতুকী ভাবোদ্দীপনার আতিশয্য ত্যাগ করে সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায় দেশবাসীর কল্যাণব্রতে তিনি অগ্রণী হয়েছিলেন। মানবতা ও স্বাদেশিকতা যে পরস্পরের সম্পূরক এবং ব্যক্তিপ্রেম বিস্তৃত হয়ে সকল সঙ্কীর্ণতার উর্ধ্বে ওঠে এবং পরিশেষে বিশ্বপ্রেমে

রূপান্তরিত হয়ে মহাজাগতিক সত্যে বিলীন হয়ে যায়। দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর নাটকগুলিতে এই সত্যকে বিশেষভাবে প্রচার করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেম সোনার মত নিখাদ এবং ইস্পাতের মত কঠিন ছিল বলে তিনি সর্বদা দেশবাসীর স্নায়ু দুর্বলতা ও উদ্যমহীন নিশ্চেষ্টতাকে নিন্দা করেছেন। তাঁর নাট্য চরিত্রগুলিও যেন তাঁর মতই আত্মসচেতনতায় দৃপ্ত। দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তায়, যুক্তিবাদের বলিষ্ঠ ভাবনার যে এক চিত্র পাওয়া যায় তা তাঁর সৃষ্ট নাটকের চরিত্রগুলির মধ্যে প্রবলভাবে বিদ্যমান। নাট্যচরিত্রগুলি যেন নাট্যকারের মতই জাতিবিদ্বেষ, সঙ্কীর্ণ স্বদেশীয়ানা, ক্ষণস্থায়ী উত্তেজনার প্রমত্ততা ও দীর্ণ গোঁড়ামির অভিমান পরিহার করতে চেয়েছে। দ্বিজেন্দ্রলার স্বদেশহিতবাদিতায় ছিলেন Constructive Nationalist। তিনি নাটকে অকারণ বিদ্বেষের অগ্নিবাণ নিক্ষেপ করেন নি, বরং কল্যাণকামী জাতিগঠন ব্রততে তিনি যেন অগ্নিহোত্রীর মত হোমাগ্নি রক্ষা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল নাটকগুলিতে স্বদেশপ্রেম বলতে যা প্রচার করেছেন তা-ধর্ম ও শ্রেণী ঐক্যবোধে সমাজে ব্যায় ও সত্যের প্রতিষ্ঠা, আত্মোন্নতি, ব্রহ্মচর্য বিস্তার, চরিত্র শক্তি বলে জাতির অন্তর্নিত ব্যক্তির বহিগর্ভ উত্থান এবং দেশবাসীর পৌরুষ এবং চৈতন্যের পুনরুদ্ধার। জ্ঞানমার্গ ও কর্মতত্ত্বের অনুশীলনও তিনি একই সঙ্গে করেছিলেন। দ্বিজেন্দ্রলাল স্বাদেশিক নাটক রচনার উদ্দেশ্যের মধ্যে জাতির অতীত ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি এবং অধ্যাত্ম সাধনাকে যুগধর্মের অনুকূলে যেমন গ্রহণ করেছিলেন তেমনি স্বাধীনতা হিতাদর্শে দেশবাসীকে আত্মশক্তি অর্জন, দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য সমস্ত প্রকার ক্ষুদ্রতা আলস্য, ঔদাস্য, জাতিভেদ দূর করার প্রয়োজনীয়তাও সমানভাবে প্রচার করেছেন।

স্বদেশী আন্দোলনের প্রথম উত্তপ্ত আবহাওয়ায় তিনি তার সহজাত উদ্দামতা নিয়েই ঝাঁপ দিয়েছিলেন সত্য, কিন্তু তাঁর জাতীয়তাবোধের একটি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ছিল। 'বয়কট' নীতি সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল সংশয়াকীর্ণ মতামত পোষণ করেছেন, "আমি বলি, এই বিদ্বেষমূলক বয়কটের দ্বারা আমাদের পরিণামে সর্বনাশ হবে, ইহাতে আমাদের স্থায়ী কল্যাণ কোনমতেও সম্ভব নয়।"[৯] বয়কট না করে তিনি আত্মোন্নতির কথা বললেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন বিষয়ে তাঁর এই প্রবণতার দিকটি লক্ষণীয়, "পার্টিশন রদ হওয়ার উপক্রম হয়েছে শুনেছি, কিন্তু বেহারের সঙ্গে আবার বিচ্ছেদ হবে নাকি? পার্টিশনের আগে আমি বলেছিলাম যে, এর একটা খুব 'ব্রাইট সাইড' আছে। তোমরা তো তখন আমার উপরে খড়্গহস্তই ছিলে। সে ভালোর দিকটা এই যে, একদিকে বাঙালি আসামীদের শিক্ষিত করুক, আর একদিকে বেহারীদের শিক্ষিত করুক। নইলে একা বাঙালির আর বল কতটুকু?" এই বক্তব্যের মাধ্যমে বুঝতে পারা যায় তিনি বঙ্গচ্ছেদ রদ করার চেয়ে বাঙালির নিজস্ব একতা স্থাপনের কথা বলেছেন। বাঙালি যদি নিজেদের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব ভুলে গিয়ে সবাই এক হতে পারে তাহলেই বঙ্গ চ্ছেদ রদ করার চেয়ে বড় কাজ করতে পারবে। রাষ্ট্রনৈতিক কর্মধারার অনুবর্তনে তিনি সুরেন্দ্রনাথের চিন্তাদর্শকে সমর্থন করতেন, কেবল ভাবপ্রবণতা যে দেশপ্রেমিকের কাজ নয় তাও তিনি মনে করতেন।

মুখ্যত দুটি কারণে তিনি এই আন্দোলন থেকে দূরে সরে এসেছিলেন, প্রথমত, তিনি বুঝেছিলেন আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ না হলে জাতির পক্ষে স্বাধীনতা অর্জন বা রক্ষণ কোনটাই সম্ভব নয়। একজন প্রাবন্ধিকের মতে, "তিনি (অর্থাৎ দ্বিজেন্দ্রলাল) স্বজাতিকে এই শিক্ষা দিয়েছেন যে, যদি দেশের দৈন্য দূর করতে হয়, তাহলে তার জন্য আমাদের মনে ও চরিত্রের যোগ্য হতে হবে, সক্ষম হতে হবে, সবল হতে হবে। আমার বিশ্বাস তাঁর দেশপ্রীতির চরম বাণী এই যে, 'আবার তোরা মানুষ হ'।"[১০] দ্বিতীয়ত, দ্বিজেন্দ্রলাল কখনোই রাজদ্রোহী ছিলেন না। রাজভক্তি ছাড়াও জাতি হিসাবে ইংরেজের প্রতি দ্বিজেন্দ্রলালের বরাবরই একটি শ্রদ্ধার ভাব ছিল। তিনি বিশ্বাস করতেন, এদেশ যে জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ হয়েছে তা ইংরেজের সংস্পর্শেই, ইংরেজের প্রভাবে জাতীয়তার শিক্ষা যাতে সম্পূর্ণ হয় সেজন্য তিনি ভারতবর্ষে ইংরেজ রাজত্বের দীর্ঘায়ু কামনা করেছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে ঐতিহাসিক নাটকের স্বর্ণযুগ বলা যেতে পারে। গিরিশচন্দ্র, ক্ষীরোদপ্রসাদ এবং দ্বিজেন্দ্রলালের প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক নাটকসমূহ এই সময়ে রচিত হয়েছিল। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে দেশের মধ্যে, যে তুমুল বিক্ষোভ এবং প্রবল আন্দোলন গড়ে উঠেছিল এই সমস্ত জাতীয় ভাবোদ্দীপক নাটক তা শক্তিশালী করে রাখতে বিশেষ সাহায্য করেছিল।

যে স্বদেশী উন্মাদনার সূচনা হয়েছিল প্রতাপাদিত্য, তারই পূর্ণ পরিণতি দেখা গেল 'প্রতাপসিংহ', 'দুর্গাদাস', 'মেবার

পতন’ প্রভৃতি নাটকে। জাতীয় মন্ত্র-দীক্ষিত দ্বিজেন্দ্রলাল পরাধীনতার ক্ষুব্ধ জ্বালা ও অপরিসীম বেদনার কথা ফুটিয়ে তোলে ভবিষ্যতের আশা ও আলোকের চিত্র অঙ্কন করে দেখালেন। তাঁর নাটকে মহাপ্রাণের আত্মবলিদানে, চারণের শোকসংগীতে এবং স্বাধীনতাব্রতী জাতির বিরাট ত্যাদের মধ্যে মর্মান্তিক কারুণ্য প্রকাশ পেলেও সঙ্গে সঙ্গে আত্মোৎসর্গের মহিমা, স্বার্থত্যাগের গৌরবে মন ভরে ওঠে, পুনরায় মহাব্রতে দীক্ষিত হওয়ার জন্য হৃদয়ে দুর্বার প্রেরণা বোধ করা যায়। ভারতবাসীর শত প্রকার দুঃখলাঞ্ছনার মধ্যেও নাট্যকার আবার সবাইকে মানুষ হওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছেন, এই সুগভীর আশাবাদ তাঁর নাটকগুলিকে অমূল্য জাতীয় সম্পদে সমৃদ্ধ করেছে।

দ্বিজেন্দ্রলালের নাট্যপ্রতিভাকে স্বদেশী আন্দোলন কতটা প্রভাবিত করেছিল তার সার্থক পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ‘রাণা প্রতাপসিংহ’ (১৯০৫) নাটকে। স্বদেশী আন্দোলনের সূত্রপাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল বাহ্যতঃ এর নব প্রবুদ্ধ দেশাত্মবোধের আদর্শ অবলম্বন করে সর্বপ্রথম এই নাটকটি রচনা করেন। নাটকটি রচনার ভিতর দিয়ে দ্বিজেন্দ্রলালের এক স্বতন্ত্র নাট্যরচনার যুগের সূচনা হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের নিজস্ব নাট্যিক গদ্য ভাষারও সার্থক উন্মেষ এখানে সর্বপ্রথম সূচিত হয়। দ্বিজেন্দ্র-গবেষক ডঃ রথীন্দ্রনাথ রায় বলেছেন, ‘‘স্বদেশী আন্দোলনের উন্মাদনায় বাঙালি চিত্রের যে অভিনব জাগরণ হয়েছিল, দ্বিজেন্দ্রলাল তাকে তাঁর ঐতিহাসিক নাটকের মধ্যে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। অতীতকে তিনি যুগ-জীবনের সমস্যার সঙ্গে সমন্বিত করে নূতন ধরনের ঐতিহাসিক নাটক পরিবেশন করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল ইতিহাসকে জীবন্ত করে তুলতে পারতেন। .... দ্বিজেন্দ্রলাল অতীত ইতিহাসের চরিত্রগুলির মধ্যে তীব্র অন্তর্দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করেছেন।’’ ঐতিহাসিক নাটক ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ থেকে রচিত হয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে দ্বিজেন্দ্রলাল যে সমস্ত ঐতিহাসিক নাটক রচনা করেন তাঁর ভাবাদর্শ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ‘প্রতাপসিংহ’র আখ্যানভাগ মূলতঃ টডের ‘রাজস্থানের কাহিনী’ থেকে গৃহীত হয়েছে। টড প্রনীত ‘রাজস্থানের কাহিনী’ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে দ্বিজেন্দ্রলাল এই যুগে অন্যান্য যে কয়টি নাটক রচনা করেছেন তাদের মধ্যে এর আখ্যানভাগেই মূলের প্রতি সর্বাধিক আনুগত্য দেখতে পাওয়া যায়। যদিও দেশাত্মবোধজাত ভাবপ্রবণতার উপর ভিত্তি করে এই নাটকটি রচিত, তথাপি ভাব-সংযম এর একটি বিশিষ্ট গুণ। মেবারের রাজ্যভ্রষ্ট রাণা প্রতাপসিংহ রাজপুত সর্দারগণকে নিয়ে মেবারের রাজধানী চিতোর উদ্ধার করার জন্যে দেবতার সামনে কঠিন শপথ গ্রহণ করলেন। রাজপুতানার সমগ্র অংশ মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েছে, রাণা প্রতাপ পরিবারবর্গসহ অরণ্যে আশ্রয় নিয়েছেন। কিন্তু মেবার মুঘল সাম্রাজ্যভুক্ত হয়েও শ্মশানতুল্য রাণা প্রতাপের আদেশে মেবারের অধিবাসীগণ মেবার ত্যাগ করে গিয়েছে। মুঘল সম্রাট আকবর রাণা প্রতাপকে বশীভূত করার জন্য তাঁর প্রধান সেনাপতি মানসিংহকে তাঁর বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে বললেন। ইতিমধ্যে মানসিংহ রাণা প্রতাপ কর্তৃক অপমানিত হওয়ায় তিনি এক বিরাট মুঘল সৈন্য নিয়ে প্রতাপসিংহকে আক্রমণ করলেন। হলদিঘাটের রণক্ষেত্রে প্রতাপ তাঁর সামান্য সৈন্যবল নিয়ে অসীম বীরত্বের সঙ্গে তাঁর সম্মুখীন হলেন। কিন্তু রাজপুত সৈন্য পরাজিত হয়। অশ্ব চৈতক যুদ্ধক্ষেত্র থেকে রাণা প্রতাপকে নিয়ে পালিয়ে যায়। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে প্রতাপ গভীর অরণ্যে আশ্রয় নেয়। মুঘল সৈন্য বারবার তাঁকে বন্দী করার চেষ্টা করতে থাকে কিন্তু তিনি বিশ্বস্ত সর্দারদের সহায়তায় সর্বদাই রক্ষা পান। পরিবার-পরিজনকে নিয়ে দুঃখ কষ্টের জ্বালা সহ্য করতে না পেরে একবার তিনি মুঘলের বশ্যতা স্বীকার করবেন বলে স্থির করলেন, কিন্তু বিশ্বস্ত অনুচরদের সাহায্য দানের প্রতিশ্রুতি পেয়ে সেই সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করেন। তথাপি রাজধানী চিতোর উদ্ধার করতে পারলেন না। এই মূল ঐতিহাসিক কাহিনীটি ছাড়া এর মধ্যে রাণা প্রতাপের ছোটো ভাই শক্ত সিংহ ও সম্রাট আকবরের ভগিনী দৌলতউন্নিসার একটি রোমান্টিক কাহিনী আছে। আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসার ব্যর্থ প্রণয়ের একটি রোমান্টিক বৃত্তান্ত এই নাট্যাখানের সঙ্গে অঙ্গীভূত করা হয়েছে।

প্রতাপসিংহের চরিত্র টড-প্রণীত রাজস্থানের কাহিনীর মধ্যে যেমন পাওয়া যায়, নাটকের মধ্যে তেমনই হুবহু বর্তমান। টড কর্তৃক উল্লিখিত প্রত্যেকটি ঘটনাকে এখানে নাট্যরূপ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। মানসিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার ঐতিহাসিক নির্দেশেই সবসময় অনুসরণ করলেও তাঁর নিজস্ব সমাজ সম্পর্কিত বক্তব্য বিষয়কে প্রকাশ করে

নেওয়ার সুযোগ গ্রহণ করেছেন। মানসিংহ মুঘলের দাস, আকবরের শ্যালকের পুত্র আর যুবরাজ সেলিমের সঙ্গে তাঁর বোনের বিয়ের কথা চলছে, এই হিসাবে হিন্দু অর্থাৎ রাজপুত সমাজে তাঁর স্থান অনেকটাই নীচে নেমে যায়। মানসিংহের এই অবস্থার সুযোগ নিয়ে নাট্যকার তাঁর মুখ দিয়ে হিন্দুসমাজের আচরণগত সঙ্কীর্ণতার কথা ব্যক্ত করেছেন। সমাজ সম্পর্কিত মানসিংহের এই সব বক্তব্যের ভিতর দিয়ে নাট্যকারের ব্যক্তিগত সামাজিক মতবাদই প্রকাশ পেয়েছে। সামাজিক সঙ্কীর্ণতা বিসর্জন দিতে না পারলে দেশাত্মবোধ যে অর্থহীন, সেটাই এখানে নাট্যকারের বক্তব্যের বিষয়। প্রতাপ সিংহের পরাজয়ের জন্য যে রাজপুত জাতির সামাজিক সঙ্কীর্ণতাই দায়ী, মানসিংহের মুখ দিয়ে নাট্যকার তাই প্রকাশ করতে চেয়েছেন এবং নাটকের মধ্যে এই কথাটাই বিশেষ করে প্রাধান্য লাভ করেছে। সামাজিক দিক থেকে প্রতাপ সিংহের চরিত্রে কোন উদারতা ছিল না। মানসিংহের পরিবারের সঙ্গে মুঘল পরিবারের একটি বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ায় তিনি মানসিংহকে অপমানিত করেন।

প্রকৃতপক্ষে নাটকটির এই প্রবল চরিত্রটির দিকে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ করলে বুঝতে পারা যায় নাট্যকার স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকায় বীরশ্রেষ্ঠ প্রতাপ সিংহের শৌর্য, বীর্য, দেশপ্রেম ও অতুলনীয় আত্মত্যাগের মহিমাময় চিত্রকেই ফুটিয়ে তুলেছেন। একজন সাহিত্যবিদের মতে, "প্রতাপসিংহ হইতেই মহাব্রতনিষ্ঠ স্বদেশী ভাবরঞ্জিত নাটকীয় যুগের সূচনা হয়।"[১১] প্রতাপের সংগ্রামশীলতা ও দুঃখবরণের কাহিনী সে যুগের রাজনৈতিক আবহাওয়ার মধ্যে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করেছে ঠিকই কিন্তু চরিত্রটির মধ্যে অন্তর্দ্বন্দ্বকে নাট্যকার ফুটিয়ে তুলতে পারেননি। নাটকের মুখ্য চরিত্রটির প্রসঙ্গ ছাড়া দেখা যায় নাটকটিতে সমসাময়িক স্বদেশবোধের প্রকাশ নানাভাবে ঘটেছে। চারণকবি পৃথ্বীরাজের পত্নী যোশীর চরিত্রটিও ঐ ভাবের বাহক। পৃথ্বীরাজও মুঘল বন্দনা ছেড়ে অবশেষে জাতীয় প্রেরণার সঙ্গীত রচনা করেছেন। সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের দিনে দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় যে দুর্বলতাগুলির কথা উল্লেখ করেছিলেন নাটকটিতে যেন তারই অবিকল প্রতিধ্বনি শুনতে পাওয়া যায়। নাটকটির শেষ পর্যায়ে মানসিংহ ও অপরাপর রাজপুত প্রধানের মধ্যে যে কথোপকথন তার থেকে ব্যাপারটি পরিষ্কারভাবে বুঝতে পারা যায়—

> " গোয়ালিয়র : ভারতের স্বাধীনতা স্বপ্নমাত্র।
> মানসিংহ : জাতীয় জীবন থাকলে তবে তা স্বাধীনতা। সে জীবন
> অনেকদিন আগে গিয়াছে, জাতি এখন পচছে।" (৫ম অঙ্ক/৬ষ্ঠ দৃশ্য)

এছাড়া নাটকে ১ম অঙ্কের ১ম দৃশ্যেই দেখতে পাওয়া যায় কালীমূর্তির নিকটে কুলপুরোহিত দণ্ডায়মান। কালীমূর্তির সামনে প্রতাপসিংহ ও রাজপুত সর্দারগণ জানু পেতে ভূমিতলস্থ তরবারি স্পর্শ করে অর্দ্ধোপবিষ্ট। রাণা প্রতাপ কালীমায়ের সামনে সকলকে শপথ করতে বলছে, সকলেও করছে তাই। কারণ এই শপথ গ্রহণের মূল বিষয় হল—চিতোরের জন্য প্রাণ দেবে—যতদিন না চিতোর উদ্ধার হয়, ততদিন ভূর্জপত্রে খাবে। তৃণশয্যায় শয়ন, বেশভূষা পরিত্যাগ, বংশ পরম্পরায় মুঘলের সঙ্গে সম্বন্ধসূত্রে বদ্ধ না হওয়া এবং মুঘল ও এদের মধ্যে তরবারি মাত্র ব্যবধান তৈরী করা। এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, রাজপুতদের আত্মত্যাগ, তাদের জন্মভূমিকে উদ্ধারের জন্য শপথ গ্রহণ প্রভৃতি স্বদেশী আন্দোলনের সামগ্রিক চিত্রকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। এছাড়া বয়কটের আদর্শও এর মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। রাজপুত রমণীর তেজস্বীতা ও বীরত্বের মাধ্যমে স্বদেশী আন্দোলনের দিকটিকে নাট্যকার এখানে তুলে ধরেছেন। পৃথ্বীরাজের স্ত্রী যোশী স্বামীর কাপুরুষতাকে, তার সন্ধিস্থাপনকে ধিক্কার জানিয়েছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকাতে হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের প্রয়াসী ছিলেন। তার প্রকাশও ঘটেছে এই নাটকে শক্ত সিংহ ও দৌলতের প্রেমের মধ্য দিয়ে। প্রতাপসিংহের কন্যা ইরা ও সম্রাট আকবরের কন্যা মেহেরউন্নিসার মধ্যে যে সখ্যের বন্ধন তৈরী করেছেন, তার অন্তর্মূলেও রয়েছে সাম্প্রদায়িক ঐক্যবোধ। আকবর ও রাণা প্রতাপকে যথার্থ বীরের সম্মান দিয়েছেন—"তোমার আসন আমার উপরে .... তুমি জয়ী, আমি বিজিত।" (৫ম অঙ্ক/৫ম দৃশ্য)

আলোচ্য এই নাটকে মানসিংহের মুখ দিয়েও নাট্যকার স্বদেশের প্রতি অকৃত্রিম ভালোবাসা ও জাতীয়তাবোধের

বাণীকে এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ‘‘জাতির প্রাণ যে ধর্ম, তা আজ মৌলিক আচার মাত্র। এসব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়। .... আচারের বন্ধনমুক্ত হয়ে যেদিন হিন্দু সমভূমিকে ‘মা’ বলে ডাকবে, সেদিন আবার হিন্দু এক হবে। আমরা কেউ তা বলতে পারি না, তাই হিন্দু পরাধীন।’’ (৫ম অঙ্ক/৩য় দৃশ্য)

পরাধীনতার এই মর্মজ্বালা নাট্যকার রাণা প্রতাপের মুখেও এভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন ‘‘প্রতাপ সিংহ/জন্মভূমি! সুন্দর মেবার! বীরপ্রসূমা! এখন এই বেশই তোমাকে সাজে মা! .... মা আমার! তোমাকে আজ মোগলের দাসী দেখে আমার প্রাণ ফেটে যায় মা।’’ (১ম অঙ্ক/৪র্থ দৃশ্য) আবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামে ঝাঁপ দিয়ে পড়তে আহ্বান জানিয়ে নাট্যকার লিখছেন— ‘‘ধাও ধাও সমরক্ষেত্রে গাও উচ্চে রণজয় গাথা।’’ অন্যদিকে মানসিংহের বক্তব্যের মাধ্যমে—‘‘আকবরের উদ্দেশ্য দেখা যাচ্ছে হিন্দু-মুসলমান জাতি এক করা, মিশ্রিত করা, সমসত্ত্বাধিকারী প্রজা করা .... যদি মুসলমান হিন্দু ধর্ম্ম গ্রহণ কর্তে পার্তে, আকবর এতদিনে কালী ভজনা কর্ত্তেন।’’ (৫ম অঙ্ক/৬ষ্ঠ দৃশ্য) অর্থাৎ এ থেকে বুঝতে পারা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গ বঙ্গের পটভূমিকায় হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের উপর বিশেষ করে জোর দিতে চেয়েছিলেন। সেজন্য হিন্দুর শত্রু মুসলমান নয়, পৃথ্বীরাজের মুখ দিয়ে নাট্যকার শুনিয়েছেন—‘হিন্দুর প্রধান শত্রু হিন্দু।’ আসলে প্রতাপসিংহকে যথার্থ বীর রূপেই এখানে তিনি দেখাতে চেয়েছেন, তিনি যুদ্ধ করে মরতে চান, বন্দী হয়ে আকবরের কাছে যেতে চান না। প্রতাপের ভাই শক্ত সিংহ প্রতাপের বিরোধিতা করে ও শেষে প্রতাপকে যথার্থ বীর বলেই সম্মান জানিয়েছেন। সেজন্যই এই বীর প্রতাপকেই ঘাতকের অস্ত্রে কোনরকমে মরতে দেননি—‘‘তুমি বীর, আমি কাপুরুষ, নীচ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে জন্মভূমির সর্বনাশ করেছি।’’

আসলে যুক্তিবাদী দ্বিজেন্দ্রলাল শক্ত সিংহকে যুক্তিবাদী মনন ও দেশের প্রতি আনুগত্য ও কর্তব্যের সমাহারে গড়ে তুলেছেন। তাই তিনি প্রচলিত সমাজ ও ধর্মের শাসনকে অস্বীকার করেছেন। এমনকি প্রেমের মতো সুকোমল হৃদয়বৃত্তিকেও তিনি যুক্তিবাদী মনের দ্বারা বিশ্লেষণ করেছেন। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীও সেই সময়ে সব কিছুকে যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তে বিচার করেছে, কেবলমাত্র অন্ধ কুসংস্কার ও আবেগের কোনরূপ বশবর্তী হয়নি। বিশেষ করে তার বিভিন্ন চরিত্রে দ্বিজেন্দ্রলালের তৎকালীন যুক্তিবাদী মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছে। ঐতিহাসিক নাট্যকার অনৈতিহাসিক চরিত্রের মাধ্যমে নিজস্ব মতবাদ ও চিন্তাধারাকে রূপ দেন। এই নাটকে সেই ধরণের প্রচেষ্টা করা হয়েছে—ইরা, মেহেরউন্নিসা ও দৌলতউন্নিসার চরিত্র চিত্রণে। দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝেছিলেন—দেশপ্রেম যদি জাগ্রত করতে হয় তাহলে মনুষ্যত্বকে জাগ্রত করতে হবে, পরস্পরের মধ্যে ঈর্ষা, দ্বেষ ও ভেদাভেদ ভুলে যেতে হবে। একটা চিঠিতে তাই তিনি স্পষ্ট জানিয়েছিলেন—‘‘মানুষে মানুষে বিদ্বেষ থাকলে মানুষের মধ্যে স্বদেশপ্রেম জাগতে পারে না।’’[১২] তাই ইরার কাছে দেশপ্রেমের চেয়েও মনুষ্যত্ব, পরোপকারবৃত্তি ও বিশ্বপ্রেম অনেক বড়। তাই এই আদর্শবাদিনী রাজপুত কন্যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে : ‘‘না বাবা, এ পৃথিবী একদিন স্বর্গ হবে। যেদিন এ বিশ্বময় কেবল পরোপকার, প্রীতি, ভক্তি, বিরাজ কর্বে, যেদিন অসীম প্রেমের জ্যোতিঃ নিখিলময় ছড়িয়ে পড়বে, যেদিন স্বার্থত্যাগেই স্বার্থলাভ হবে—সেই স্বর্গ।’’ (৩য় অঙ্ক/৭ম দৃশ্য)

‘প্রতাপসিংহ’-এর পর ‘রাজস্থানের কাহিনী’ থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে দ্বিজেন্দ্রলাল এইরকমই আর একটি নাটক রচনা করেন ‘দুর্গাদাস’। ‘প্রতাপসিংহ’ নাটকটিতে স্বাদেশিকতার প্রভাবের পাশাপাশি যেমন ঐতিহাসিক নাটক হিসেবে মর্যাদা লাভ করেছে, তেমনি ‘দুর্গাদাস’ নাটকে রোমান্টিক ভাবটাই প্রবলভাবে ধরা পড়েছে। যার কারণে ঐতিহাসিক মর্যাদা এখানে একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছে। এর কাহিনীভাগটি এরকম—ঔরঙ্গজেবের চক্রান্তে যোধপুররাজ যশবন্ত সিংহের মৃত্যু হলে সম্রাট তাঁর বিধবা পত্নী মহামায়া ও শিশুপুত্র অজিত সিংহকে বন্দী করতে চান। কিন্তু মারবাড় সেনাপতি দুর্গাদাসের অসীম সাহসিকতায় রাণী ও রাজপুত্র ঔরঙ্গজেবের কবল থেকে মুক্ত হয়ে মেবারের রাণা জয়সিংহের আশ্রয় লাভ করেন। ঔরঙ্গ জেব তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য সসৈন্যে মেবার আক্রমণ করেন। রাজপুত সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধের মুঘল সৈন্য পরাজিত হয়। দুর্গাদাস বিজয়ী রাজপুত সৈন্যের অধিনায়কত্ব করেন। পরাজিত মুঘল সৈন্য এবারও রাজপুত সৈন্যের কাছে পরাজিত হয় আর ঔরঙ্গজেবের পুত্র আকবর সপরিবারে বন্দী হন। অতঃপর ঔরঙ্গজেব রাজপুতদিগের সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হয়ে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর পুত্র শম্ভুজীকে দমন করার জন্য অগ্রসর হন। স্বামীর রাজ্যকে নিষ্কন্টক করে পুত্র অজিত সিংহকে

সিংহাসনে বসিয়ে যশোবন্তের স্ত্রী স্বামীর উদ্দেশ্যে জ্বলন্ত চিতায় আত্মবিসর্জন করেন। ঔরঙ্গজেবের ক্রোধ থেকে শাহজাদা আকবরকে আশ্রয় দেওয়ার অপরাধে রাজপুত দলপতিগণ দুর্গাদাসকে পরিত্যাগ করেন। দুর্গাদাস আকবরসহ শম্ভুজীর আশ্রয় প্রার্থনা করেন। সেখানে শম্ভুজীর এক মুসলমান অনুচরের বিশ্বাসঘাতকতায় দুর্গাদাস ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন। সম্রাজ্ঞী গুলনেয়ার বন্দী দুর্গাদাসের কাছে প্রণয় নিবেদন করলে তিনি সেটা প্রত্যাখ্যান করেন। তাঁর চরিত্রবলে মুগ্ধ হয়ে ঔরঙ্গজেবের সেনাপতি দিলির খাঁ তাঁকে মুক্ত করে দেন। দুর্গাদান পুনরায় রাজপুত দলপতিদের আহ্বানে রাজপুতানায় ফিরে আসেন। তাঁর আশ্রিত শাহজাদা আরবর বৈরাগ্য অবলম্বন করে মক্কা যাত্রা করেন। অজিত সিংহ কর্তৃক আকবরের কন্যা রাজিয়াকে ঔরঙ্গজেবের হাতে সমর্পণ করার অপরাধে দুর্গাদাস পুনরায় নির্বাসিত হয়ে বৈরাগ্য অবলম্বন করেন। এরপর দাক্ষিণাত্যে শম্ভুজী ঔরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হয়ে নিহত হলে কিছুদিন পর ঔরঙ্গজেবের সেখানে মৃত্যু হয়।

মোট কথা নাটকটিতে দুর্গাদাসের চরিত্রের মধ্যে দিয়ে আদর্শ দেশপ্রেম ও সেই সঙ্গে নৈতিক চরিত্রবল দেখানোই এই নাটকের উদ্দেশ্য। আর সেটি দেখাতে গিয়ে নাট্যকার এখানে কতকগুলি পরস্পর সম্পর্কহীন বিচ্ছিন্ন ঘটনার পরিকল্পনা করেছেন। রাজপুত বীরত্বের আদর্শকে সবদিক থেকেই জয়মাল্য দ্বারা ভূষিত করতে গিয়ে নাট্যকার এখানে কাহিনীর বাস্তবতা সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে গেছেন ঠিকই, তবে দ্বিজেন্দ্রলালের পরিকল্পনায় দুর্গাদাস আদর্শমাত্রে পর্যবসিত হয়েছেন। নাট্যকার সে যুগের দেশপ্রেমিকতার আদর্শকে দুর্গাদাসের স্বদেশপ্রেম, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, কর্তব্যনিষ্ঠা ও চরিত্রবলের মধ্য দিয়ে রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলালের মতে দুর্গাদাস আদর্শ পুরুষ, তাঁর অসীম সাহস, প্রভুভক্তি অতুলনীয়, কর্তব্যবুদ্ধি তীক্ষ্ণ, তিনি আশ্রিতবৎসল ও সর্বোপরি সচ্চরিত্র। পূর্ববর্তী নাটক 'প্রতাপসিংহ'র রাণা প্রতাপের চরিত্রের সঙ্গে 'দুর্গাদাস' নাটকে দুর্গাদাসের চরিত্রের তফাৎ হল রাণা প্রতাপের স্বদেশপ্রীতির মধ্যেও তাঁর একটা মর্ত্যপরিচয় ছিল, তাঁর স্বদেশপ্রীতি যেমন বিশেষ একটা দেশকেই কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছিল, তাঁর মর্ত্য পরিচয়ও তাঁর নিজস্ব পরিবারকে কেন্দ্র করেই প্রকাশ পেয়েছিল। কিন্তু দুর্গাদাসের জীবন নির্বিশেষ আদর্শবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত। আসলে এই নাটকটিতে নাট্যকার স্বদেশ ও স্বজাতিবোধের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। রাণা প্রতাপের উপজীব্য ছিল রাজপুত বীরের স্বাধীনতা সংগ্রাম যা বঙ্গ ভঙ্গের পটভূমিকায় উপযোগী 'দুর্গাদাস' নাটকেও তাই। 'প্রতাপসিংহ'তে বীরের বন্দনা থাকলেও স্বাধীনতা সংগ্রামের জয়যুক্ত পরিণতি দেখানো হয়নি। সেই পরিণতির অভাবটুকু দূর করার সংকল্প নিয়েই নাট্যকার বর্তমান এই নাটকটি রচনাতে হাত দেন। ভূমিকায় নাট্যকার নিজে সে কথা স্বীকার করেছেন—"আজ পর্যন্ত হিন্দু পাঠক নভেলে (রাজসিংহ ভিন্ন) কেবল বিজাতীয়ের কাছে স্বজাতীয়ের পরাজয় বার্তাই পড়িয়া আসিয়াছেন। একদিন এই একঘেয়ে পরাজয়ের পর, এই দুর্গাদাসের বিজয় দুন্দুভি তাঁহাদের কর্ণে সঙ্গীত বর্ষণ করিবে না কি?"[১৩]

স্বদেশী আন্দোলনের সময় জাতীয় বীররূপে দুর্গাদাসকে নাট্যকার অঙ্কিত করেছেন। প্রকৃতপক্ষে দুর্গাদাসের উচ্ছ্বসিত দেশপ্রেমের উপর চরিত্রবলের প্রাধান্য দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে। চরিত্রটির মধ্যে আদর্শের আতিশয্য বড্ড বেশি। বঙ্গ ভঙ্গের পটভূমিকায় স্বদেশপ্রেমের সহনীয়তাকে, বীরত্বের রূপকে অতিমাত্রায় দেখানোর পক্ষপাতী ছিলেন নাট্যকার—যা তখনকার নেতাদের মধ্যে অভাব ছিল। সেজন্য হয়তো চরিত্রটির মধ্যে উচ্ছ্বসিত স্বদেশপ্রেম ও অপূর্ব বীরত্বের উপস্থাপনা করেছেন। রাণা প্রতাপের স্বদেশপ্রীতির মধ্যে যে মর্ত্য পরিচয় ছিল এখানে এই চরিত্রে তার একটু অভাব। আসলে দ্বিজেন্দ্রলাল প্রকৃত স্বদেশপ্রেমের পরকাষ্ঠা এই চরিত্রটির মধ্যে দেখাতে চেয়েছেন। অসাধারণ বুদ্ধিচাতুর্য্য, বীরত্ব, আত্মত্যাগ, আভিজাত্যবোধ, প্রভুভক্তি, কর্তব্যবোধ, সুমহান দেশপ্রেম প্রভৃতি গুণাবলী দ্বারা নাট্যকার এই রাঠোর বীরের চরিত্রকে ভূষিত করেছেন। নাট্যকার বীর চরিত্রকে উপস্থাপন করতে গিয়ে বীরের সমূহ গুণাবলীকে তিনি এই চরিত্রে স্থাপন করে বঙ্গভঙ্গের পটভূমিকায় দর্শকদের উপহার দিয়েছেন। এছাড়া বঙ্কিমচন্দ্রের রাজসিংহের প্রভাবে নাট্যকার রাজপুত বীরের হাতে মুঘল সম্রাটের চরম পরাজয়ের চিত্র অঙ্কন করে নাটকটিতে হিন্দু স্বজাত্যের আভাস দিয়েছেন। দুর্গাদাসের সংগ্রামে, রাজসিংহের স্বহিতৈষণায় এবং যশোবন্ত পত্নীর স্বদেশবোধাত্মক বক্তৃতায় দ্বিজেন্দ্রলালের দেশপ্রাণতাই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া বঙ্গচ্ছেদ আন্দোলনের সমসময়ে বাংলা জাতীয় সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারায় হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে একটি

ভ্রাতৃত্বভাবের সঞ্চারের প্রয়াস দেখা দেয়। এই নাটকে দুর্গাদাস ও কাশিমের সম্মিলনের মাধ্যমে নাটকের যবনিকাপাত ঘটেছে। সেই সঙ্গে হিন্দু-মুসলমানের মিলন সম্ভাবনাকে নাট্যকার প্রভুভক্ত কাশিম ও দিলীর খাঁর মাধ্যমে উপস্থাপন করেছেন।

রাজস্থানের কাহিনীমূলক নাটকের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের 'মেবার পতন' নাটকটি এককালে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। রাজপুত ইতিবৃত্তিমূলক এটি দ্বিজেন্দ্রলালের সর্বশেষ নাট্য রচনা। রাজস্থানের কাহিনীমূলক নাট্যরচনার মধ্যে ঐতিহাসিক মূল্য 'প্রতাপ সিংহ' থেকে অধিক না হলেও অন্তত তার সমতুল্য বলে গণ্য করা যেতে পারে। এখানে রোমান্টিক প্রভাব অপেক্ষাকৃত অল্প বলে অনুভূত হয়। কিন্তু কাহিনীবিন্যাস, চরিত্রসৃষ্টি ও অন্যান্য নাট্যিক পরিকল্পনায় এর স্থান 'প্রতাপ সিংহ' থেকে অনেক নিচে। এর বিচ্ছিন্ন দৃশ্যের মাধ্যমে নাট্যকার সুনিপুণভাবে স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিকে তুলে ধরেছেন। এর কাহিনীটি হলো—প্রতাপ সিংহের পুত্র অমর সিংহ তখন মেবারের রাণা, তাঁর রাজধানী উদয়পুর। মেবারের পূর্বতন রাজধানী চিতোর মুঘলের অধিকারভুক্ত। মুঘল সৈন্য মেবার আক্রমণ করে, হেদায়েৎ আলী খাঁ মুঘল সৈন্যের অধিনায়ক হয়ে আসেন, কিন্তু রাজপুতদিগের পরাক্রমে তিনি পরাজিত হয়ে পালিয়ে যান। শীঘ্রই শাহাজাদা পরভেজের অধিনায়কত্বে মুঘল সৈন্য নূতন বিক্রমে এসে মেবার আক্রমণ করে। মুঘলের আশ্রিত সগর সিংহ এবার মুঘল সৈন্যের সঙ্গে আসেন। এই সগর সিংহ মুঘল সেনাপতি মহাবৎ খাঁর পিতা এবং রাণা প্রতাপের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা। কিন্তু এবারও রাজপুত সৈন্যের হাতে মুঘলের পরাজয় হয়। অবশেষে এই মহাবৎ খাঁ এক বিপুল মুঘল বাহিনী নিয়ে মেবার আক্রমণ করে। পূর্বের দুই যুদ্ধে মেবারের বহু সৈন্য ক্ষয় হয়, এবার আর মুঘল সৈন্যকে বাধা দেবার তার শক্তি ছিল না, মেবারের পতন হয়, উদয়পুর দুর্গ মুঘল সৈন্য অধিকার করে নেয়।

কাহিনীর দিক থেকে এটি 'প্রতাপ সিংহ' নাটকেরই পরিশিষ্ট বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রতাপ আজীবন সংগ্রাম করে মেবারের যে অংশ মুঘলের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেছিলেন তার পুত্র অমর সিংহের কালে তাও কিভাবে পুনরায় মুঘলের করতলগত হল তাই এই নাটকের প্রতিপাদ্য বিষয়। কিন্তু মেবারের এ পতনের মূলে একটা বিষয়কে মুখ্য করা হয়েছে, তা ধর্মান্তরাশ্রিত মহাবৎ খাঁর স্বজাতিবিদ্বেষ। স্বজাতিবিদ্বেষই যে জাতির ধ্বংসের মূল তা মহাবতের বাক্য ও আচরণে সর্বত্রই প্রকাশ করা হয়েছে। জাতীয় ঐক্যের উপরই রাষ্ট্র ভিত্তি স্থাপিত হতে পারে। এই জাতীয়মূলক উদ্দেশ্যে ব্যতীত এর একটা ধর্মসম্বন্ধীয় মতবাদ-প্রচারের উদ্দেশ্য ছিল, তা এই যে রাজপুত জাতির ধর্মীয় সংকীর্ণতাই তার পতনের মূল। যতদিন পর্যন্ত না হিন্দুর সামাজিক আচারগত সংকীর্ণতার অবসান হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত তার জাতীয় কল্যাণের আশা নেই। জাতীয়তার প্রেরণা বাঙালির সামাজিক সংকীর্ণতার বাধা ঘোচাতে পারেনি দেখে এবং সন্ত্রাসমূলক স্বদেশী আন্দোলনের ভয়াবহ পরিণতির প্রতি লক্ষ্য করে দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁর সর্বশেষ জাতীয়তাবোধক নাট্যরচনা এই বলে উপসংহার করেছেন।

অমর সিংহের চরিত্র পরিকল্পনায় নাট্যকার ঐতিহাসিক মর্যাদা যথাসম্ভব অক্ষত রেখেছেন। অমর সিংহের পরে মহাবৎ খাঁর চরিত্রটি উল্লেখযোগ্য। নাট্যকার এই চরিত্রটির ভিতর দিয়ে তাঁর বিশিষ্ট একটি রাজনৈতিক মতবাদকে প্রকাশ করেছেন। মহাবৎ খাঁই নিজের জন্মভূমির স্বাধীনতাকে শত্রুর হাতে তুলে দেন। এর কারণ, ধর্মান্তরাশ্রিত মহাবতের উপর তাঁর স্বজাতীয় ও স্বদেশীয়ের অনুদার ও সংকীর্ণ আচরণ। মেবারের প্রকৃত শত্রু মুঘল নয়—মেবারেরই সন্তান মহাবৎ এবং মহাবতের তীব্রতম স্বদেশদ্রোহিতাই মেবারের পতনের মূল। কিন্তু মহাবতকে মেবারের শত্রু কে করেছে? হিন্দুধর্মের অনুদারিতাই মহাবতকে মেবারের শত্রু করেছে। মহাবতের পূর্ব জীবনের হিন্দু স্ত্রী কল্যাণী তাঁর স্বামীর অন্য ধর্ম গ্রহণ করার পরও তাঁর প্রতি আসক্ত জানতে পেরে তাঁর পিতা তাঁকে ঘর থেকে বিতাড়িত করে দেন। এতেই মহাবৎ স্বজাতি ও স্বদেশীয়ের বিরুদ্ধে প্রতিহিংসা গ্রহণ করার জন্য অস্ত্র ধারণ করেন। হিন্দুধর্মের সংকীর্ণতায় মহাবতের স্বজাতিদ্রোহিতার জন্ম এবং স্বজাতিদ্রোহিতা ও ভ্রাতৃদ্রোহিতাই মেবারের পতনের মূল। মহাবৎ খাঁকে এখানে স্বজাতিদ্রোহিতার প্রতীক করে চিত্রিত করা হয়েছে। এজন্যই মহাবতের মধ্য দিয়ে চরিত্রসৃষ্টির প্রয়াস অপেক্ষা মতবাদ প্রচারের প্রবৃত্তিই অধিকতর স্পষ্ট বলে অনুভূত হয়। স্ত্রী চরিত্রের মধ্যে রুক্মিণীর চরিত্রে একটু বাস্তবতার স্পর্শ আছে। মহাবতের পত্নী কল্যাণীর চরিত্রটিও আদর্শ-প্রণোদিত সৃষ্টি।

মেবার পতনের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বদেশপ্রেমিকতার উচ্ছ্বাস অনেকটা স্তিমিত হয়ে আসে। এর কারণ জাতীয়তা

অপেক্ষা মনুষ্যত্বকে নাট্যকার এখানে বড় করে দেখেছেন, প্রেমের মধ্য দিয়ে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ-ভ্রাতৃদ্রোহিতা, স্বজাতিদ্রোহিতা যার অন্তরায়, দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের মধ্য দিয়ে সেই মনুষ্যত্বের সন্ধান করেছেন। পরাধীনতার শৃঙ্খল এই জাতি নিজের হাতেই নিজে পরেছে, নিজের হাতেই তাকে মোচন করতে হবে। এটিই তাঁর এই নাটকের প্রধান বক্তব্যের বিষয়। সমসাময়িক রাজনৈতিক অবস্থা থেকে তিনি এই চৈতন্য লাভ করেছিলেন—এই দিক থেকে এই নাটকে যুগলক্ষণ অত্যন্ত প্রবল মনে হয়। স্বদেশী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বাংলার হিন্দু মুসলমানের বিরোধের দিকটা যখন ক্রমশঃ স্পষ্ট হয়ে উঠতে থাকে, তখনই দ্বিজেন্দ্রলাল জাতীয় মিলনের কল্যাণকর আদর্শ এভাবে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেন। প্রকৃতপক্ষে বলা যায় নাটকটিতে জাতীয় ভাবধারার প্রতিফলন থাকলেও জাতীয় প্রেমই সমাপ্ত নয়, তা বিশ্বপ্রেমে পরিব্যাপ্ত। উগ্র স্বদেশবোধ থেকে দ্বিজেন্দ্রলালের মানসিকতার পরিবর্তনের এটি একটি জীবন্ত স্বাক্ষর। নাট্যকার স্বয়ং তাঁর উদ্দেশ্যের কথা নাটকের ভূমিকাতে বলেছেন, "এই নাটকে আমি একটি মহানীতি লইয়া চলিয়াছি, সে নীতি বিশ্বপ্রেম। কল্যাণী, সত্যবতী ও মানসী এই তিনটি চরিত্র যথাক্রমে দাম্পত্য প্রেম, জাতীয় প্রেম এবং বিশ্বপ্রেমের মূর্ত্তিরূপে কল্পিত হইয়াছে। এই নাটকে ইহাই কীর্তিত হইয়াছে যে, বিশ্বপ্রীতিই সর্বাপেক্ষা গরিয়সী।"

নাট্যকার সমসাময়িক স্বদেশী আন্দোলনের অন্তর্নিহিত ত্রুটি সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এই সময় দেবকুমার রায়চৌধুরীকে লেখা একটি চিঠিতে তাঁর মনোভাব এভাবে ব্যক্ত করেছেন—"আমি জানি, বিশ্বাস করি, বেশ যেন দেখতে পাচ্ছি, যে যাই বলুক, যতই কেন আমাদের নগণ্য ও হেয় ভেবে উপেক্ষা করুক না কেন—আমরা আবার জাগব, উঠব, মানুষ হব।"[১৪] দ্বিজেন্দ্রলালের এই মনোভাব প্রকাশ এই নাটকে চারণীদের কণ্ঠে এভাবে উচ্চারিত হয়েছে—

"কিসের শোক করিস ভাই আবার তোরা মানুষ হ'।
গিয়েছে দেশ দুঃখ নাই, ... আবার তোরা মানুষ হ'।....
ঘুচাতে চাস যদিরে এই হতাশাময় বর্তমান।
বিশ্বময় জাগায়ে তোল ভায়ের প্রতি ভায়ের টান।" (৫ম অঙ্ক / ৮ম দৃশ্য)

দ্বিজেন্দ্রলালের যুক্তিবাদী মন জাতীয়তা অপেক্ষা মনুষ্যত্বকেই বড় বলে মনে করেছে। প্রেমের মধ্য দিয়ে যে মনুষ্যত্বের বিকাশ—ভ্রাতৃদ্রোহিতা, স্বজাতিদ্রোহিতা যার অন্তরায় দ্বিজেন্দ্রলাল এই নাটকের মধ্য দিয়ে সেই মনুষ্যত্বের সন্ধান করেছেন। কল্যাণী দাম্পত্যপ্রেম, সত্যবতী দেশপ্রেম, মানসী বিশ্বপ্রেমের মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েছে। ভাবপ্রাধান্য নাটকটির নাট্যশিল্পের অন্তরায় হলেও তার দ্বারাই সমসাময়িক জাতীয়তাবোধ সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রমানসের প্রত্যক্ষ পরিচয় পাওয়া যায়।

সুতরাং সবকিছুর পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় জাতীয়তাবোধ যখন অত্যন্ত উগ্রভাবে প্রকাশ পেল, তখন জাতীয় জীবনে সাময়িক প্রয়োজনের তাগিদে দ্বিজেন্দ্রলালের মতো অন্যান্য মণীষীরা সে আন্দোলনকে নানাভাবে অনুপ্রাণিত করার চেষ্টা করেন। কিন্তু সাধারণ মানুষেরা এই বিষয়টিকে উপলব্ধি না করলেও এইসব মণীষীরা বুঝেছিলেন যে এই জাতীয়তাবোধের মধ্যে একটা সংকীর্ণতা রয়েছে। সত্যকার জাতীয়তাবাদী যিনি, তাঁর স্বদেশপ্রেম যতই অকৃত্রিম হোক না কেন নিজের দেশের জিনিস ছাড়া অন্য সবই তার কাছে তুচ্ছ। উগ্র জাতীয়তাবাদীরা অন্য দেশের আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতি সমস্ত কিছুকে অবজ্ঞার চোখে দেখেন। নিজের দেশে তৈরী সবকিছুকে মহৎ কল্পনার দ্বারা উজ্জ্বল করে তোলেন। এ ব্যাপারে তাঁরা গোঁড়া এবং রক্ষণশীল। স্বদেশের প্রতি ধূলিকণা তাঁদের আকৃষ্ট করে। এঁদের কাছে বিদেশের ঠাকুরকে দূরে ফেলে দিয়ে স্বদেশের কুকুর পূজিত হয়। ফলে অন্য দেশের মানুষের সামগ্রিক কল্যাণ তাঁদের কাছে কোন গুরুত্ব পায় না। এই সংকীর্ণতার মধ্যে সত্যকার মণীষী কখনোই আত্মিক যোগ অনুভব করতে পারে না। কিন্তু স্বাধীনতালাভের উগ্র কামনায় পরাধীন জাতির মর্মবেদনা ও শৃঙ্খলমুক্তির গান শুনিয়ে জাতিকে সঞ্জীবিত করার যে মন্ত্র সাময়িকভাবে তৎকালীন প্রয়োজনে এইসব মণীষীরা স্বদেশপ্রেমের মাধ্যমে স্বাদেশীকতাবোধকে নাটকের মধ্য দিয়ে জাগিয়ে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল তাই এমনি একজন ব্যক্তিত্ব যিনি বুঝেছিলেন শুধু স্বদেশের কল্যাণই নয়, জগতের কল্যাণই সত্যকার কল্যাণ। সমস্ত জগতের মানুষের কল্যাণ কামনাই সত্যকার ব্রত। দ্বিজেন্দ্রলালের চিন্তায়

ভাবনায় পরাধীনতার বেদনা ছিল, স্বাধীনতার স্পৃহাও ছিল উত্তাল, কিন্তু কোথাও প্রত্যক্ষভাবে ইংরেজ বিরোধিতার কথা বলেননি। তিনি বাঙালিকে সকল কলুষতা-তামসিকতার ঊর্ধ্বে উঠে মনুষ্যত্বের পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণে ও বিশ্বমৈত্রীর আদর্শে দীক্ষিত করেছেন। শুধু তাই নয় একদিকে যেমন তিনি দেশের বন্ধনমুক্তির সাধনা করেছেন, তেমন অন্যদিকে এর সঙ্গে সঙ্গে মানবতার মুক্তির সাধনাতেও নিজেকে নিয়োজিত করেছেন। দ্বিজেন্দ্রলাল কোনোদিন বলেননি বিদেশীকে তুচ্ছ করতে, বলেননি দেশের মঙ্গলই শেষ কথা। বরং তাঁরা বলেছেন শুধু স্বদেশ নয়, সর্বদেশের কল্যাণই সত্যকার কল্যাণ। বিশ্বমৈত্রীর বাণীকে তিনি প্রচার করেছেন, তাই তিনি জাতীয় কবি হয়েও আন্তর্জাতিক। শুধু স্বদেশের নয়, বিশ্বমানবের বন্ধন বেদনায় তিনি কাতর হয়েছেন।তাঁর রচনায় শুধু স্বদেশবাসী নয়, বিশ্ববাসী নিজেদের কথা শুনতে পেয়েছে। তাই বলা যায় দ্বিজেন্দ্রলাল শুধু নিজের দেশের প্রতিনিধি নন—তিনি বিশ্বমানবের প্রতিনিধি।

তথ্যসূত্র

১. 'বিলেতে যাইয়া বহু রঙ্গমঞ্চে বহু অভিনয় দেখি এবং ক্রমেই অভিনয় ব্যাপারটি আমার কাছে প্রিয়তর হইয়া ওঠে।'— আমার নাট্যজীবনের আরম্ভ, নাট্যমন্দির, শ্রাবণ, ১৩১৭।
২. কিন্তু তাঁহার সঙ্গে যে দুদিনও মিশিত সেই মুগ্ধ হত দেখে তিনি গভীর বেদনা বোধ করতেন দেশবাসীর মনে প্রাণে অসাড়তায়—স্বাধীন চিন্তার দৈন্যের-সর্বব্যাপী ক্লীবত্বে। .... তাই তিনি বিদ্রুপ ছেড়ে ধরেছিলেন নাটক ও দেশাত্মবোধক গান গেয়েছিলেন, আমরা ঘুচাব মা তোর কালিমা, চেয়েছিলেন—'আবার আমরা মানুষ হই।' উদাসী দ্বিজেন্দ্রলাল, দিলীপকুমার রায়, পৃ. ৩৩৭।
৩. 'দ্বিজেন্দ্রলালের এই স্বদেশ-ভক্তি সর্বজনীন দয়া, মৈত্রী ও শুভেচ্ছায়।' দ্বিজেন্দ্রলাল, দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৭৩৭।
৪. ভারতীয় নাট্যমঞ্চ, হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত।
৫. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, পৃ. ২৮০।
৬. দ্বিজেন্দ্রলাল (১৩২৮), দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৩৯৩।
৭. P. Guha Thakurata, Bengali Drama, London, 1930, P. 154.
৮. দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, ১৩২৮, পৃ. ৪৩৮।
৯. তদেব, ১৩২৩, পৃ. ৩৯২।
১০. প্রমথ চৌধুরী, সবুজপত্র, ১২২৩, আষাঢ় সংখ্যা।
১১. অজিত কুমার ঘোষ, বাংলা নাটকের ইতিহাস, পৃ. ২৮০।
১২. দ্বিজেন্দ্রপত্র দেবকুমার রায়চৌধুরীকে (০২.০৫.১৯০৬), দেবকুমার রায়চৌধুরী, দ্বিজেন্দ্রলাল, পৃ. ৪৪৪।
১৩. দ্বিজেন্দ্রলাল, নবকৃষ্ণ ঘোষ, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃ. ১৪৮।
১৪. দেবকুমার রায়চৌধুরীকে (০২.০৫.১৯০৬) লিখিত পত্র, দ্বিজেন্দ্রলাল : দেবকুমার রায়চৌধুরী, পৃ. ৪৪৪।

গ্রন্থঋণ

১. বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস, আশুতোষ ভট্টাচার্য, এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রা. লি.।
২. বাংলা নাটকের ইতিহাস, অজিতকুমার ঘোষ, জেনারেল।

ড. উজ্জ্বলা পাইক মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
যোগেশচন্দ্র চৌধুরী কলেজ, কলকাতা

নির্মাণ-বিনির্মাণ : জীবনানন্দের ছোটগল্প

ড. মাধুরী বিশ্বাস

বাংলা কথাসাহিত্যের 'জল হাওয়ায়' পাঠকের আবহমান পাঠভ্যাসে কবি জীবনানন্দ দাশের (১৮৯৯-১৯৫৪) উপন্যাস ছোটগল্প সাহিত্যের 'পাড়া-জাগান সাড়া' না তুলতে পারলেও তাঁর মনোভঙ্গি স্বাতন্ত্র্য ঋদ্ধিবান মর্যাদার স্বীকৃতি পেয়েছিল। যদিও সংখ্যাটি চূড়ান্ত নয়, এখনো পর্যন্ত প্রাপ্ত প্রকাশিত রচনা ১১টি উপন্যাস ও ১১৩ টি ছোটগল্পের লেখক রূপে জীবনানন্দ বাংলা কথাসাহিত্যে প্রবলভাবে একটা স্বতন্ত্র স্থান দাবি করেন। কবি জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব গদ্যভাষাতে উপন্যাস-গল্প লিখেছেন অবিভাজ্য কবি সত্তা অক্ষুণ্ণ রেখে, তবে সঙ্গত কারণে দীর্ঘদিনের বাংলা কথাসাহিত্যের গদ্যভাষার সঙ্গে কথাশিল্পী জীবনানন্দ সম্মানজনক দূরত্বে অবস্থান করেছেন। তাই কবিতার মতো তাঁর কথাসাহিত্য প্রথম থেকে সাধারণ পাঠককে আকর্ষণ করতে পারেনি। তবে মেধাবী-সংবেদনশীল পাঠক জীবনানন্দের গল্প উপন্যাসের রসগ্রাহী হয়ে উঠেছিল, তাঁর গল্প উপন্যাসের প্রকাশলগ্ন থেকেই।

১৯৫৫ সালে 'অনুক্ত' পত্রিকার কার্তিক-পৌষ সংখ্যায় প্রকাশিত হয় জীবনানন্দের প্রথম ছোটগল্প 'গ্রাম ও শহরের গল্প'। কিন্তু জীবনানন্দ তখন প্রয়াত হয়েছেন। তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দ দাশ জানান—''জীবনানন্দের আকস্মিক মৃত্যুর পর তাঁর সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। বেশির ভাগ রচনা এক্সারসাইজ বুকে লিখিত ছিল। সে সব লেখার অধিকাংশ প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত কবিতা। কিছু অসম্পূর্ণ গল্প ও উপন্যাস ছাড়া কয়েকটি সম্পূর্ণ গল্প ও তিনটি সম্পূর্ণ উপন্যাস এই সব রচনার অন্তর্গত ছিল। সম্পূর্ণ গল্প তিনটি 'অনুক্ত' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল।'' স্বভাবতই এই গল্প প্রকাশের ব্যাপারে তাঁর কোনো ভূমিকাই ছিল না। শুধু তাই নয়, এটাও সকলের জানা যে, এরপর একের পর এক গল্প নানা স্থানে প্রকাশিত হতে থাকে এবং যে সংখ্যা আজ শতাধিকে দাঁড়িয়েছে।

'গ্রাম ও শহরের গল্প', 'বিলাস' ও 'ছায়ানট'—এই তিনটি গল্প সুকুমার ঘোষ ও সুবিনয় মুস্তাফী সম্পাদিত ''জীবনানন্দ দাশের গল্প'' সংকলনে (১৩৭৯) প্রকাশিত হয়। ৯৭টি গল্প দেবেশ রায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর বিভিন্ন খণ্ডে এবং ১৩টি গল্প ভূমেন্দ্র গুহ সম্পাদিত 'সমরেশ ও অন্যান্য গল্প' সংকলনে প্রধানত ১৯৮৫ থেকে আরম্ভ করে ২০০৪ সালের মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে। জীবনানন্দ প্রধানত ১৯৩১, ১৯৩২, ১৯৩৩ ও ১৯৩৬—এই চারটি বছরেই প্রায় অধিকাংশ গল্পগুলি লিখেছিলেন। ১৯৩১ সালে ১৩টি, ১৯৩২ সালে ৩৭টি, ১৯৩৩ সালে ২৩টি এবং ১৯৩৬ সালে ২৪টি অর্থাৎ মোট ১১৩টি গল্পের মধ্যে এই চারটি বছরেই ৯৭টি গল্প লিখেছেন।

জীবনানন্দ যেন একটা ঘোরের মধ্যে থেকে একের পর এক গল্প লিখে চলেছেন—অনেক সময় একই বিষয়, একই চরিত্র, একই পরিণয় নিয়ে পর পর গল্প লিখে গেছেন। তাঁর গল্পের পাণ্ডুলিপি অনুলিপির অভিজ্ঞতা জানিয়েছেন আফসার আমেদ—''তাঁর পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করার একটা সমস্যা ছিলই। এবং গল্প শেষ করতেন প্রচলিত রীতি না মেনেই। এখানেও একটা সমস্যা দাঁড়ায়। খাতার অন্য কোনোখানে গল্পটা শেষ করছেন কিনা দেখতে হয়। এরকমটা যদিও হয়নি। পরের গল্প শুরু হওয়া দিয়ে আমরা শেষটা বুঝে নিই। আমাদেরও এক এক সময় প্রশ্ন থাকে, গল্পটা হয়তো শেষ করলেন না। দ্বিতীয়ত আর একটা বিভ্রান্তির কারণ ঘটে একই গল্প পুনর্বার টুকছি কিনা। আমরা তখন প্রকাশিত গল্পের প্রথম লাইনগুলির সঙ্গে নতুন টুকতে বসা গল্পের প্রথম লাইন মিলিয়ে নিই। বিভ্রান্ত হবার একটাই কারণ, তিনি সাধারণত একই রকম নারী-পুরুষ পুনর্ব্যবহার করেন তাঁর গল্পে। চেনা বিষয়ও চেনা লাগে পাত্র-পাত্রীদের তাই। পাত্র-পাত্রীর প্রেম ও অপ্রেমের সমস্যা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ও আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্য বার বার তিনি আনলেও অন্যতর এক গল্পের দিকে

বিশ্বাস, ড. মাধুরী : নির্মাণ-বিনির্মাণ : জীবনানন্দের ছোটগল্প
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 1, June 2019, Page : 13-24, ISSN 2249-4332

নিয়ে যান তিনি।"[১]

বিবাহ পরবর্তী কর্মহীন বেকার জীবনে (১৯৩০-১৯৩৫) জীবনানন্দের হাত থেকে একের পর এক ছোটগল্প নিঃসৃত হয়েছে। ছোটগল্পের সঙ্গে সঙ্গে 'কারুবাসনা', 'জীবনপ্রণালী', 'প্রেতিনীর রূপকথা', 'বিভা' ইত্যাদি উপন্যাসগুলিও এই বেকার জীবনের সংকটকালেই (১৯৩৩) লিখিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে ছোটগল্পের প্রবাহ স্তিমিত হলেও স্বাধীনতা পরবর্তী সংকটকালে (১৯৪৮) বরিশালের বাসভূমি থেকে উৎখাত হওয়া কবি কলকাতায় বসে সকলের অজ্ঞাত 'জলপাইহাটি', 'মাল্যবান', 'সুতীর্থ', 'বাসমতীর উপাখ্যানে'র মতো দীর্ঘ উপন্যাসগুলি লিখেছিলেন।

জীবনানন্দের ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ঃ

জীবনানন্দ তাঁর ছোটগল্পগুলির বিষয়বস্তু নির্মাণে ও পরিকল্পনায় কখনো পর্যবেক্ষণগত অভিজ্ঞতা, কখনো ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, আবার কখনো-বা এই দুইয়ের মিশ্র অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়েছেন। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে আমরা ব্যাপক অর্থেই ধরছি এবং জীবনানন্দের ছোটগল্পের সেই সকল বিষয়বস্তুর অভিজ্ঞতাকে বলছি যেগুলির সঙ্গে লেখকের কোনো না কোনো ব্যক্তিগত জীবনের সম্পর্ক রয়েছেন। যেমন শিক্ষকের অভিজ্ঞতা, বেকারত্বের অভিজ্ঞতা, জীবনবিমার এজেন্টের অভিজ্ঞতা, দাম্পত্য জীবনে স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব, সংকট ইত্যাদির অভিজ্ঞতা, শিল্পী-লেখক-কবির অভিজ্ঞতা ইত্যাদি। আর যে-সকল গল্পের থিমের সঙ্গে লেখকের ব্যক্তিজীবন বা অন্তরজীবন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত নয়—সেখানে চতুষ্পার্শ্ব থেকে তীক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ মারফৎ সঞ্চিত অভিজ্ঞতার সাহায্যে বিষয়বস্তু নির্মিত হয়েছে। আবার কিছু কিছু গল্পের থিমে বাস্তব কোনো অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়নি—লেখকের মনন ও কল্পনা প্রতিভা একটা সম্ভাব্য অন্য ভুবন তৈরি করেছে। ফলত থিমকে বা থিমের উৎসকে বুঝতে হলে লেখকের জীবন চরিতকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। গ্রহণ করতে হবে নানা প্রত্যক্ষ পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং অবশ্যই কিছুটা বৌদ্ধিক অনুমান।

আমরা জীবনানন্দের সমগ্র ছোটগল্পের বিষয়বস্তু ও থিমকে কয়েকটি শ্রেণিতে বিভক্ত করতে পারি,

(ক) অর্থসর্বস্বতা ঃ বিনষ্ট মূল্যবোধ
(খ) প্রেম/প্রেমতত্ত্বমূলক গল্প
(গ) দাম্পত্যকেন্দ্রিক গল্প ঃ i) দাম্পত্য জীবনে বিচ্ছিন্নতা
ii) দাম্পত্য জীবনে সংকট
iii) সদ্য বিবাহ ঃ বধূর রূঢ়তায় সম্পর্কের অস্থিরতা
(ঘ) বেকারত্ব ঃ অস্তিত্বের আত্মসংকট
(ঙ) শিল্পীর সংকট
(চ) শিক্ষক জীবন

ক) অর্থসর্বস্বতা ঃ বিনষ্ট মূল্যবোধ

অর্থসর্বস্বতা থেকে মূল্যবোধের বিনষ্টিকে জীবনানন্দ কিছু গল্পের থিম হিসাবে গ্রহণ করেছেন। 'মেয়েমানুষ', 'হিশেব-নিকেশ', 'কথা শুধু - কথা, কথা, কথা, কথা, কথা', 'একঘেয়ে জীবন' ইত্যাদি গল্পগুলিতে এই জাতীয় থিম পাওয়া যায়।

প্রধানত নাগরিক, উচ্চবিত্ত শ্রেণির মানুষরাই এই জাতীয় গল্পের চরিত্র হিসাবে এসেছে। জীবনে টাকা রোজগারই এদের মূল লক্ষ্য। ব্যাঙ্কে এদের প্রত্যেকেরই প্রচুর টাকা আছে। এরা নানা ধরনের ব্যাবসার সঙ্গে জড়িত। সমাজের সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করায় যাবতীয় ভোগবাসনা তৃপ্ত করতে এরা কোনো কসুর করে না। মূল্যবোধ বলে এদের কাছে কিছু নেই। বন্ধুকে ফাঁকি দিয়ে বন্ধুপত্নীকে শারীরিকভাবে ভোগ করা বা তার আকাংক্ষা, ঘরে স্ত্রীকে ফাঁকি দিয়ে নানা ধরনের বাজারী মেয়েমানুষের সঙ্গে ফুর্তি করা বেশ কিছু গল্পের থিম হিসাবে উঠে এসেছে। এরই সঙ্গে থিমে যুক্ত হয়েছে লক্ষ্মীহীনভাবে টাকা রোজগার, অন্তঃসার শূন্যতা, দুর্নীতি, আত্মমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে প্রচার লোলুপতা ইত্যাদি নৈতিক স্খলনের নানা প্রসঙ্গ।

হেমেন্দ্র-দ্বিজেন ('মেয়েমানুষ'), অবনীশ-রাখাল ('হিশেব-নিকেশ'), ভবশঙ্কর-গঙ্গাধর মিত্তির ('কথা শুধু-কথা, কথা, কথা, কথা, কথা') প্রভৃতি চরিত্রের মধ্যে এই জাতীয় বৈশিষ্ট্যগুলি ফুটে উঠেছে।

কথা শুধু - কথা, কথা, কথা, কথা, কথা ঃ জীবনের কোমল বিষয়ে নিরাসক্ত, অর্থসর্বস্ব, নীতিহীন, আত্মমর্যাদাহীনতার আর একটি গল্প হল—"কথা শুধু - কথা, কথা, কথা, কথা, কথা"। সম্পাদক দেবেশ রায় কৃত এই অসাধারণ নামকরণটির মধ্যেই রয়েছে অন্তঃসারশূন্যতার ব্যঞ্জনা। গল্পটির সূচনা হয়েছে একটি চমকপ্রদ বাক্য দিয়ে—"ভবশঙ্কর একটি মস্তবড় বাঙালি লাইফ ইনসিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যান কিন্তু প্রত্যেক মিটিঙেই সেক্রেটারি তাকে প্যাঁদায়।" (৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৭)। পঁয়ত্রিশ-ছত্রিশ বছর বয়সী ছোকরা সেক্রেটারির হাতে প্রতিনিয়ত অপদস্থ ও অপমানিত হবার যে সুর গল্পের শুরুতেই ধ্বনিত হয়েছে তা থেকে প্রবীণ ডাক্তার ভবশঙ্কর কখনোই মুক্তি পায়নি।

ভবশঙ্কর অত্যন্ত প্রচার ও পদলোলুপ ধরনের মানুষ। আত্মমর্যাদা খুইয়ে ও অপমানিত হয়েও পদ আঁকড়ে থাকার মানসিকতা তার মধ্যে দেখা গেছে। সেক্রেটারির কাছে অপদস্থ হয়ে পদত্যাগের চিঠি নিয়ে তিন-চার বছর ধরে মিটিঙে গেছেন, কিন্তু চূড়ান্ত অপমানিত হয়েও তা কখনো জমা দেননি। এর থেকে তার চরিত্রের ব্যক্তিত্বের অভাব ও পদমোহই ফুটে উঠেছে। ডাক্তারি ও ব্যবসা করে ভবশঙ্কর প্রচুর অর্থ জমিয়েছেন। কিন্তু উদ্দেশ্যহীনভাবে অর্থ উপার্জন তার কোন্ কাজে আসবে তা তিনি বুঝতে পারেন না। প্রেম-নারী-সৌন্দর্য-স্বপ্ন-কল্পনা কখনো তার মনে বাসা বাধেনি। এই ভবশঙ্করের প্রিয় বন্ধু গঙ্গাধর মিত্তির, যার জীবন দর্শন হল—'নিজের জন্য সফলতা পেতে হলে অপরকে না মেরে উপায় নেই।' (ঐ, পৃ. ১৬০)। ভবশঙ্কর অবশ্য বন্ধুর দর্শনে বিশ্বাসী ছিলেন না।

ভবশঙ্কর অত্যন্ত প্রচার লোলুপ ও নিঃসার প্রকৃতির মানুষ। কংগ্রেসের সভায় নিজের রুচি ও বিশ্বাসের বিরুদ্ধে দীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন। তারজন্য অসম্ভব কষ্ট পেলেন—"সমস্ত রাত বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগল ভবশঙ্কর। নিজের ব্যক্তিত্বের ওপর গভীর ধিক্কারে, জীবনের এই দুরপনেয় মিথ্যাচারে—কিন্তু সবচেয়ে বেশি কংগ্রেসের আহ্লাদিকে তার নিজেরই মাথায় তুলে এমন ন্যাংটা-নাচনার ক্ষোভে দুঃখে অন্ধতায় বেল্লিকপনায় বিছানায় পড়ে ছটফট করতে লাগল ভবশঙ্কর।" (ঐ, পৃ. ১৬৪)। অথচ এত মনঃকষ্টের পরও এমন একটা কাজের জন্য তিনি পুরস্কার আশা করেন। পরের দিন সকালে সমস্ত সংবাদপত্র তন্নতন্ন করে খুঁজলে নিজের কাজের প্রশংসা জানার জন্য। কিন্তু যখন দেখলেন কোনো কাগজই সেইভাবে তাঁর বক্তৃতাকে গুরুত্ব দেয়নি, তখন তিনি খুবই বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

জীবনে প্রচুর অর্থ-প্রাচুর্য-পদ গৌরবের অধিকারী হয়েছেন ভবশঙ্কর, একমাত্র পুত্রকেও যথাযথ করে মানুষ করেছেন, চরম দারিদ্র্য থেকে নিজের পরিবারকে দাঁড় করিয়েছেন—তবু তাঁর মন নিরাশায় আজ পূর্ণ। অনেক দাম দিয়ে বেশ কিছু ছবি তিনি কিনেছেন - তবু তার রস উপভোগ করতে তিনি অপারগ। কবিতা গল্পও তাঁকে কোনো পরিতৃপ্তি দিচ্ছে না। বাড়িতে উপভোগের জিনিস খুঁজতে গিয়ে বধূর কথা তাঁর মনেই হল না। শেষ পর্যন্ত ইন্সিওরেন্স কোম্পানির চেয়ারম্যানের কাজই তিনি আঁকড়ে ধরলেন—এতে প্রচুর টাকা জমবে 'একটা ছবি বা সাহিত্য বা কংগ্রেসের আহ্লাদি, বা খবরের কাগজের প্রশংসা বা স্ত্রীকে উপভোগ করতে যাওয়ায় চেয়ে—এ ঢের ভালো।" (ঐ, পৃ. ১৭০) অর্থাৎ এ গল্পে ভবশঙ্করের জীবন এক অর্থে আত্মমর্যাদাহীন, নিঃসার, ব্যর্থ জীবনেরই একটা প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠেছে।

খ) প্রেম/ প্রেমতত্ত্বমূলক গল্প ঃ প্রেম বা প্রেমতত্ত্বমূলক গল্পগুলি জীবনানন্দ নির্মাণ করেছেন প্রধানত পর্যবেক্ষণ, কল্পনা ও মননের মিশ্রণে। ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর প্রেম সম্পর্কের কোনো কথা জানা যায় না। বরং নারীদের সামনে তিনি যে বড় বেশি সঙ্কুচিত থাকতেন সে বিষয়ে অনেকেই সাক্ষ্য দিয়েছেন। প্রতিভা বসু যেভাবে জীবনানন্দকে পর্যবেক্ষণ করেছিলেন, তা তিনি 'জীবনানন্দ' নামক স্মৃতিচারণায় উল্লেখ করেছেন—"বুদ্ধদেব নিজের প্রিয় কবিটিকে দেখে খুশিতে 'চা দাও, চা দাও'। জীবনানন্দের মুখেচোখেও একটা আনন্দের ধারা ভাসমান হয়ে উঠেছিল, আমি যেতেই সর্বনাশ। গা মোড়ামুড়ি করে কী করবেন তা যেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। চোখ পায়ের নিচের সিমেন্ট দেখতে ব্যস্ত। বোঝা গেল উনি কোন মেয়ের চোখের দিকে তাকান না।"[২]

জীবনানন্দের এই ধরনের সঙ্কুচিত ব্যক্তিত্বের পাশে তাঁর মনোজগতের গোপন একটি দিককে এখানে উল্লেখ করতে চাই। 'জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি বা Literary Notes জুলাই - সেপ্টেম্বর ১৯৩১', নামক আলোচনায় ভূমেন্দ্র গুহ 'Literary Notes' নামে জীবনানন্দের ডায়েরি থেকে একটা তথ্য উল্লেখ করেছেন—"এদিকে কলকাতার পথে-ঘাটে ক্বচিৎ দু'একটি মেয়ে তাদের বিশিষ্ট রূপচারিত্র্য নিয়ে তাঁর চোখে আটকে যাচ্ছেঃ তাঁর কোনো এক অনেক কাল আগের পরিচিত গ্রাম্য কিশোরীর কথা মনে প'ড়ে যাচ্ছে এবং একটু উন্মনা হয়ে পড়ছেন তিনি; হঠাৎ মনে হচ্ছে তাঁর বিবাহিত না হলেই হয়তো ভালো হত। 'আমার y' ব'লে যে, মহিলাকে তিনি বিশেষিত করেছেন, যিনি অনেক বছর ধ'রে তাঁর নিদ্রাজাগরণ মথিত ক'রে রেখেছেন, তিনিও স্বেচ্ছায় তাঁর প্রাসঙ্গিকতা থেকে স'রে যাচ্ছেন, তাঁকে তাঁর জন্মদিনে টেলিফোন করলে তিনি নিরুত্তর থাকছেন।"[৩]

অর্থাৎ বাস্তব জীবনে নারীদের সামনে জীবনানন্দ সঙ্কুচিত আড়ষ্ঠ থাকলেও তাঁর অন্তর জগতে নিত্য যাতায়াত করছে পথেঘাটে দেখা কিছু কিছু বিশিষ্ট রূপচারিত্র্যের নারী। পাশাপাশি অবশ্যই কল্পনাপ্রতিভা ও মননও এই জাতীয় গল্পের থিম নির্মাণে সাহায্য করেছে- 'উপেক্ষার শীত'; 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস'; 'বিবাহিত জীবন'; 'প্রণয়ী-প্রণয়িনী'; 'জামরুলতলা'; 'করুণার পথ ধরে'; 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়' ইত্যাদি গল্পে নির্মিত হয়েছে এই জাতীয় থিম।

থিমি ঃ কিছু গল্পের প্রেম / প্রেমতত্ত্বমূলক থিম একই ধরনের ।কখনো কখনো মনে হয় যে এগুলি ঠিক সেই অর্থে প্রেমের গল্প নয়, বরং প্রেম বিষয়ক তত্ত্বই প্রধান হয়ে উঠেছে।

এখানকার থিম হিসাবে দেখা যায় প্রেমিকের বিবাহ উপলক্ষে প্রেমিকার আবির্ভাব হয়েছে। প্রেমিকের অন্য নারীর সঙ্গে বিবাহ—অথচ এ ব্যাপারে প্রেমিকার কোনো বিকার নেই। প্রেমিক দীর্ঘদিন অপেক্ষা করেছে, কিন্তু প্রেমিকার কাছ থেকে বিবাহের ব্যাপারে কোনো সাড়া না পেয়ে জীবনের একটা কর্ম হিসাবে অন্য নারীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে চলেছে। অন্যদিকে বিবাহের চূড়ান্ত আয়োজনের মধ্যেও প্রেমিক প্রেমিকার সঙ্গে সময় কাটাচ্ছে, কিন্তু প্রেমিকার আনন্দিত ভাবভঙ্গি দেখে দুঃখবোধে লীন হচ্ছে। আসলে প্রেমিকের বিবাহের আয়োজনের মধ্যেও প্রেমিকার আবির্ভাব, বিবাহের আনন্দে মেতে ওঠা প্রেমিকের মনে কী ধরনের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে তাই এই জাতীয় গল্পের থিম হিসাবে গড়ে উঠেছে। তবে এই ধরনের গল্পগুলিতে থিম বা কাহিনিবৃত্তের গুরুত্ব কম। সেইভাবে কোনো কাহিনিবৃত্তই গড়ে ওঠেনি, পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা কথোপকথন চলেছে- ঘটনা এগোয়নি। গল্পের গতিও অত্যন্ত মন্থর।

আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস ঃ গল্পটিতে দেখা যাচ্ছে প্রমথর সঙ্গে কল্যাণীর সাত-আট বছরের প্রেমের সম্পর্ক। অথচ প্রমথ সুপ্রভা নামে এক অজানা মেয়েকে বিয়ে করতে চলেছে। সেই বিবাহসভায় যোগ দিতে কল্যাণী অনেক আগেই আমন্ত্রিত হিসাবে উপস্থিত হয়েছে। বিয়েতে প্রচুর আনন্দ করবে বলে পরিকল্পনাও করেছে।

কল্যাণীর সঙ্গে দোতলার একটা নিরিবিলি কোঠায় প্রমথ দুপুরবেলায় বিয়েবাড়ির সমস্ত কাজ ফেলে গল্প করতে বসেছিল। খানিকটা অনাহুতের মতোই সেখানে হঠাৎ আবির্ভূত হয় তাদের পূর্বপরিচিত শুভেন্দু। শুভেন্দু খানিকটা গায়ে পড়া ধরনের মানুষ। শুভেন্দুর উপস্থিতিতে প্রমথ মাঝে মধ্যেই ফ্ল্যাসব্যাক কল্যাণীর সঙ্গে তার জীবনের ঘনিষ্ঠতার পর্বে ফিরে ফিরে যাচ্ছিল।

ভালোবাসার গোড়ার দিকে থেকেই প্রমথ জানত যে কল্যাণী তাকে ভালোবাসলেও কখনোই তার শরীরটাকে সে প্রমথকে ছুঁতে দেবে না, প্রমথর সঙ্গে অন্য কোনো নারীর বিবাহ ঘটাতে পারলেই সে সবচেয়ে প্রসন্ন হবে এবং ভবিষ্যতে নিজেও আইবুড়ো থাকবে না। তা সত্ত্বেও প্রমথ তাকে ভালোবেসেছে, এমনকী কল্যাণী ছাড়া পৃথিবীর সমস্ত নারীসৌন্দর্যই তার কাছে অত্যন্ত কদর্য, কুৎসিত, নিরর্থক মনে হয়েছে। "এই মেয়েটিকে নিয়েই প্রমথের জীবনের প্রধান ভালোবাসার প্রথম ও শেষ; এরপর যে-সব প্রণয় ও আকাঙ্ক্ষা আসবে, জীবনের বিচারকে তা এত অভিভূত করে রাখতে পারবে না" (১ম খণ্ড, পৃ. ২৯০)।

আজ এই 'পরিপূর্ণ মেয়ে মানুষ'কে ছেড়ে, সাত-আট বছরের সমস্ত সম্পর্ককে ছেড়ে প্রমথ অন্য এক নারীকে বিয়ে

করতে চলেছে। তবু শুভেন্দুর কল্যাণীর সঙ্গে গায়েপড়া ঘনিষ্ঠতা তাকে বিচলিত করে, বিরক্ত করে। কল্যাণীর দিদির জামাই ললিতবাবু তার চুল টেনে, গাল খামচে, নাক ডলে দিয়ে তামাসা করে শুনে প্রমথ স্তম্ভিত হয়ে যায়। জীবনের ছ-সাতটা মূল্যবান বছর অপেক্ষা করেও সে কল্যাণীর শরীরের কুহকের সূক্ষ্মতাকে উন্মোচিত করতে পারেনি - কেবল নিজের যৌবনটাকে অকর্মণ্য, জীবনটাকে নিরর্থক করে ফেলেছে। তবু কল্যাণীর সুন্দর শরীরের মোহ, তার মাদকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেনি।

প্রমথ কল্যাণীর রূপ,তার ভালোবাসা, প্রেম, পরিণাম, ব্যাথা, ঈর্ষা, দৌরাত্ম্য, মাদকতা ইত্যাদি নিয়ে মনে মনে ভাবতে থাকে। প্রমথর ধারণা কল্যাণীকে সেই তৈরি করেছে—"কিন্তু তবুও অন্য কারো জন্য ওকে তৈরি করে দিয়ে গেল শুধু প্রমথ। ফসল যেদিন আসবে সে দিন চাষিকে আর পাবে না কল্যাণী" (ঐ, পৃ. ২৯৫)। শুধু প্রমথর আশঙ্কা, যে-ব্যক্তি কল্যাণীর জীবনে ভবিষ্যতে আসবে সে তাকে ঠিকমত উপভোগ করতে পারবে তো ? প্রমথর এসব ভাবনার আজ আর কোনো মূল্য নেই। তার এসব গভীর ভাবনাকেও কল্যাণী আজ আর মূল্য দেবে না—তাই শুভেন্দুর সঙ্গে সস্তা দরের 'পাঁচালি' করতে করতে তারা উভয়ে প্রমথর উপস্থিতিকেই বিস্মৃত হয়েছে।

গ) দাম্পত্যকেন্দ্রিক গল্প ঃ

জীবনানন্দের সমগ্র ছোট গল্পের একটা বড় অংশ জুড়েই আছে দাম্পত্য-কেন্দ্রিক থিম। তবে এই দাম্পত্য কোথাও সেইভাবে সুখ বা তৃপ্তির দাম্পত্য হয়ে ওঠেনি। জীবনানন্দ ব্যক্তিগত জীবনে দাম্পত্যের আস্বাদ পেয়েছিলেন—তবে সে দাম্পত্যে তিনি সম্ভবত কোনো সুখ খুঁজে পাননি। জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠ কিছু ব্যক্তির অভিজ্ঞতা এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করতে পারে।

বিরাম মুখোপাধ্যায় ঃ "নিজের বাসাতেই কবি থাকতেন বহিরাগতের মতো। একদিন হঠাৎ আমায় জিজ্ঞাসা করেছিলেন, যদি স্ত্রী আপনার আমন্ত্রণে ঘনিষ্ঠ হবার প্রস্তাবে সায় না দেয়, কি করবেন ? কি করা উচিত ? দাম্পত্য সম্পর্কের যে অস্বাভাবিকতার বীজ এই প্রশ্নটির মধ্যে রয়েছে সেই অস্বাভাবিকতা কবির পারিবারিক জীবনে লক্ষ্য করেছিলাম। ... শুনেছি শ্রীমতী জীবনানন্দ নাকি প্রায়ই বাড়ি ফিরতেন বেশি রাত করে। জীবনানন্দের মধ্যে সব সময়ের ম্রিয়মানতাও লক্ষ্য করেছি। দাম্পত্য জীবনে রজনীগন্ধার ঘ্রাণে সুরভিত আরহ'র পরিবর্তে একটা বিষায়িত পরিমণ্ডল প্রতিদিন ঘনীভূত হতে থেকেছে।"[৪]

অমিতানন্দ দাশ ঃ "শেষ স্মৃতি (আমার দাদুর মায়ের বাবার) বাড়ির সামনের ঘরে সাদা পাঞ্জাবী গায়ে সাদা বিছানায় শোয়ানো জ্যাঠামশায়ের মরদেহ। জেঠিমা খুব গুণী এবং কম বয়সে বেশ সুন্দরী ছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওঁদের দুজনের ভাল মনের মিল হয় নি। "[৫]

জীবানন্দের কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনী উদ্‌ঘাটনে এবং তাঁর অভিজ্ঞতার কিছুটা দিগ্‌নির্দেশে এই কয়েকজনের অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, অভিমত ও মন্তব্য আমাদের অনেকাংশেই সাহায্য করতে পারে। সাহিত্য সৃষ্টিতে অভিজ্ঞতার একটা বড় গুরুত্ব আছে বলে স্বয়ং জীবনানন্দ বিশ্বাস করতেন। 'Bengali Novel Today' নামে একটি প্রবন্ধে বাংলা কথাসাহিত্যের তিন বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে আলোচনা কালে জীবনানন্দ একজন সাহিত্যস্রষ্টার তিনটি গুরুত্বপূর্ণ গুণের কথা উল্লেখ করেছেন—অভিজ্ঞতা, কল্পনা-প্রতিভা ও মনন—"It has been observed that their experience is large and varied, but imagination and intellect probably not of the highest type."[৬]

বিরাম মুখোপাধ্যায় জীবনানন্দের দাম্পত্য সম্পর্কের কিছু প্রসঙ্গ (পূর্বে উদ্ধৃত হয়েছে) উল্লেখ করার পর মন্তব্য করছেন—"আমার এই আশঙ্কা, এই অনুমানগুলি পরবর্তীকালে কবির নিজের হাতেই তাঁর 'মাল্যবান' উপন্যাসে বিস্ফোরকভাবে বিয়োগান্ত বিক্ষোভের আকারে প্রকাশিত।"[৭]

নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার পাশাপাশি দাম্পত্যকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার চেষ্টা করেছেন জীবনানন্দ। অনেক ক্ষেত্রেই হয়তো তিনি নিজের দাম্পত্য অভিজ্ঞতার সঙ্গে পর্যবেক্ষণগত ও মস্তিষ্ক প্রসূত দাম্পত্য-কল্পনাকে যুক্ত করে নানা

প্রেক্ষাপটে গল্পের থিম নির্মাণ করেছেন। জীবনানন্দের দাম্পত্যকেন্দ্রিক গল্পগুলিকে আমরা তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারি।

a. দাম্পত্য-জীবনে বিচ্ছিন্নতা
b. দাম্পত্য-জীবনে সংকট
c. সদ্য বিবাহ ঃ বধূর রূঢ়তায় সম্পর্কের অস্থিরতা

দাম্পত্যকেন্দ্রিক অধিকাংশ গল্পেই দেখা যায় স্বামী বেকার, অন্তর্মুখী, স্ত্রীর প্রতি উদাসীন এবং তাদের একটি ছোট শিশু বর্তমান; আর অন্যদিকে দারিদ্র লাঞ্ছিত সংসার জীবনে বিপর্যস্ত স্ত্রীর শানিত, কুপিত বাক্যবাণ উপর্যুপরি স্বামীর উপর বর্ষিত হচ্ছে। স্বামী চরিত্রটির অবশ্য তাতে তেমন কোনো বিকার নেই। বরং দেখা যায় সংসার জীবনে তার কোনো তৃপ্তি নেই। সংসার জীবন, দাম্পত্য সম্পর্ক, বিবাহ এসব স্বামী চরিত্রদের ভিতরে ভিতরে আরো নিঃসঙ্গ করে তুলেছে- এমনকী স্ত্রীর মৃত্যু বা অন্য কোনো যোগ্যতর পুরুষের সঙ্গে যদি স্ত্রীর সম্পর্ক হয়, তবে এরা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচে - মুক্তি পায়। এমনকী কিছু গল্পে দেখা গেছে গর্ভবতী স্ত্রী নানা অযত্নে ধীরে ধীরে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে- অথচ স্বামী নির্বিকারভাবে কলকাতার মেসে বসে রয়েছে—'মা হবার কোনো সাধ'; 'প্রণয় প্রেমের ভার'; 'প্রেমিক স্বামী'; 'জন্মমৃত্যুর কাহিনী'; 'পূর্ণিমা'; 'শাড়ি' ইত্যাদি গল্পগুলিকে দাম্পত্যকেন্দ্রি গল্প বলা যায়।

a) দাম্পত্য-জীবনে বিচ্ছিন্নতার গল্প

প্রেমিক স্বামী ঃ এই গল্পটি প্রভাত ও মলিনার একটি দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প। এখানকার দাম্পত্য সম্পর্কের মধ্যে একটা সংকটের আবহাওয়া তৈরি হয়েছে প্রধানত একান্নবর্তী পরিবারে স্ত্রী মলিনার অতিরিক্ত সাংসারিক দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ায়। সংসারের সকলের দায়িত্ব সামলিয়ে স্বামীকে দেবার মত অবশিষ্ট সময় আর মলিনার থাকে না। রাত্রে অবসন্ন শরীরে স্বামীর কাছে এসে তার প্রতি সকলের অবিচারের কথাই সে শোনায়। দাম্পত্য-সম্পর্কের মধ্যে কোনো আবেগঘন কোমল উচ্ছ্বাস গড়ে ওঠার সুযোগ পায় না।

প্রভাত প্রেমিক প্রকৃতির মানুষ। সে চায় স্ত্রীকে নিয়ে নিজের মতো করে সময়ে কাটাতে। কিন্তু ক্রমশই সে বুঝতে পারে সংসারের যাতায় মলিনা যেভাবে গিয়ে পড়েছে, সকলের কাছেই যেভাবে অপরিহার্য হয়ে উঠেছে, তাতে স্বামী বলে অতিরিক্ত কিছু মলিনার কাছ থেকে পাওয়া সম্ভব নয়। এই ভাবনা প্রভাতের বুকের মধ্যে মোচড় দিয়ে যায়। প্রভাত মলিনার থেকে চায় 'বস্তু' অর্থাৎ তার সংসর্গ, স্পর্শ। কিন্তু প্রভাত ক্রমশ বুঝতে পারে যে মলিনার মধ্যে তার প্রতি ভালোবাসা কমে গেছে।

প্রতিবেশী মীরা-ছুটুদের পরিবার মলিনাকে তিনমাসের জন্য দিল্লি নিয়ে যেতে চায়। প্রভাতও ভাবে মলিনা যাক ওদের সঙ্গে—জীবনের অন্য এক স্বাদের উপলব্ধি হবে তার। পরিবারের অন্যদের যাবতীয় আপত্তি অগ্রাহ্য করে প্রভাত মলিনাকে মীরাদের সঙ্গে দিল্লি পাঠিয়ে দিল।

দিল্লিতে তিন মাসের জায়গায় ছ-সাত মাস কাটিয়ে দিল মলিনা। শারীরিক ও মানসিকভাবে মলিনা অনেক তরতাজা হয়ে উঠেছে। কিন্তু মলিনা স্বামীর কাছে ফিরে আসতে পারছে না। ভুজঙ্গবাবুদের কাছে মলিনা নিজেকে এতটাই অপরিহার্য করে তুলেছে যে তারা তাকে কিছুতেই ছাড়তে চাইছেন না। মলিনাও ফিরে আসার তেমন কোনো আগ্রহ দেখায় না। বছর ঘুরে গেল। প্রভাত একবার দিল্লি গেল—কিন্তু ভুজঙ্গবাবুরা তাকে ছাড়লেন না। মলিনা এখন অনেক সুস্থ ও সুন্দর হয়ে উঠেছে—সে অনেক সুখে শান্তিতে তৃপ্তিতে আছে। প্রভাতের উপলব্ধিতে ধরা পড়ল তাদের দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি—ভুজঙ্গবাবুর পুত্র ''সমরের সঙ্গে সম্বন্ধেই মলিনার পরিণতি, উন্নতি, আনন্দ, মঙ্গল—সমস্তই।'' (৭ম খণ্ড, পৃ. ১১২)

b) দাম্পত্য সংকটের গল্প

জন্মমৃত্যুর কাহিনী ঃ এটি একটু ভিন্ন প্রকৃতির দাম্পত্য সম্পর্কের গল্প। উমাতারার মৃত্যুতে সৌরীনের দশ বছরের দাম্পত্য জীবনের সমাপ্তি হল। এরপর আরও দু'বছর কেটে গেল। অতঃপর শঙ্করী নামে এক ষোলো বছরের নারীকে সৌরীন

বিবাহ করল। কিন্তু সৌরীনের হৃদয়ে আজ আর কোনো প্রেম নেই—মৃত স্ত্রীর জন্য বিচ্ছেদের বেদনা আজও তার হৃদয়কে আর্দ্র করে রেখেছে।

অপরদিকে ষোড়শী যুবতী শঙ্করী নবীন প্রেমের উচ্ছ্বাস সালংকারা হয়ে আনন্দে বিভোর হয়ে আছে। জীবনের সুন্দর ও মধুর ধারণা ও কল্পনা শঙ্করীর সম্বল। রূপচর্চা ও সুন্দর বস্ত্রে আচ্ছাদিত হয়ে বিয়ের পর বেশ কয়েকদিন মহানন্দে সে কাটিয়ে দিল।

বিয়ের দিন দশেক বাদে সৌরীন নববধূর সাজসজ্জা নিয়ে বিরক্ত প্রকাশ করলেন - তাকে আটপৌরে সাজে থাকতে নির্দেশ দিলেন। শঙ্করী যে আনন্দ উচ্ছ্বাসে ভাসমান ছিল, স্বামীর এই ব্যবহারে তা প্রবল ধাক্কা খেল। শঙ্করী গম্ভীর ও স্তব্ধ হয়ে গেল।

সৌরীনের প্রথম পক্ষের স্ত্রী উমাতারার একটি বছর সাতেকের কন্যা ছিল। এই কন্যাটিকে শঙ্করী খুব ভালোবাসত। বিয়ের আট-দশদিন বাদে একদিন রাত্রে এই রেণু সৌরীনের পাশে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ে। সৌরীন শঙ্করীকে বলে রেণুকে তার ঠাকুমার ঘরে রেখে আসতে। কিন্তু শঙ্করী কিছুটা মজার সুরেই বলে মা-মরা মেয়ে একদিন বাপের সঙ্গে শুয়েছে, আজ এখানেই থাকে। বিয়ের আট দশদিন বাদে স্ত্রীর পরিবর্তে মেয়েকে নিয়ে শোওয়ার প্রস্তাব সৌরীন মেনে নেওয়ায় শঙ্করী বিস্মিত হয়ে যায়, তার বিশ্রী ও বিরস লাগে। এমনই অনেক ছোট ছোট শঙ্করীর মনকে অত্যন্ত দমিয়ে দিল।

শঙ্করী ক্রমে ক্রমে বুঝতে পারে মৃত স্ত্রীর স্মৃতি আজও সৌরীনের মধ্যে অত্যন্ত টাটকা হয়ে আছে। ক্রমে মৃত উমাতারাই যেন শঙ্করীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়ায়। সৌরীনও শঙ্করীর মধ্যে মৃত স্ত্রীকে ফিরে পাবার চেষ্টা করতে লাগল। ষোলো বছরের মেয়েটির যাবতীয় স্বপ্ন কল্পনা ভেঙে পড়তে থাকে, দাম্পত্য জীবনও বিস্বাদ লাগতে শুরু করে।

আবার স্বামী একটু সোহাগভরে কথা বলতে শুরু করলেই যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতি ধুয়ে মুছে যায়—দাম্পত্য জীবনের বিস্বাদ কেটে যেতে থাকে। শঙ্করী নানা গন্ধের তেল মাথায় মাখা সত্ত্বেও সৌরীন তার কোনো সৌরভ টের পায় না। অথচ সেই সৌরীনই একটি বিশেষ সুগন্ধী তেল কিনে সেটি শঙ্করীকে ব্যবহার করতে বলে। সেই তেলের সুগন্ধে সৌরীন মৃত স্ত্রীর স্মৃতিমেদুরতায় আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে—উমাতারার সঙ্গে তার দাম্পত্য জীবনের স্মৃতি যেন সে ফিরে পায় এই সুগন্ধে—উমাতারা এই সুগন্ধী তেলটি নিয়মিত ব্যবহার করত। সৌরীনের এই স্মৃতি এবং উমাতারার পছন্দের জিনিসগুলি শঙ্করীর উপর আরোপ করে তার স্মৃতিকে জাগরুক করে রাখার চেষ্টা দেখে শঙ্করী অত্যন্ত ব্যথিত ও বিমূঢ় হয়ে পড়ল।

নতুন দাম্পত্য জীবনের কোনো অনুভূতি বা ষোড়শী স্ত্রীর প্রতি কোনো প্রেম কিছুই সৌরীনের হৃদয়ে নেই। শঙ্করী যেন বেঁচে থেকেও একজন মৃত ব্যক্তি। বোঝাই যায় বিমূঢ় শঙ্করীর দাম্পত্য জীবনের সুখ-স্বপ্ন একটা বড় ধাক্কা খেয়ে খাদের কিনারে গিয়ে পড়েছে।

c) সদ্য বিবাহ ঃ বধূর রূঢ়তায় সম্পর্কের অস্থিরতা

একই থিম বা বিষয়কে কেন্দ্র করে জীবনানন্দ পরের পর অনেক গল্প লিখে যেতেন। সদ্য বিবাহিত পুরুষের স্ত্রী ও প্রেম সম্পর্কিত উচ্ছ্বাস, আবেগে, কল্পনা চূড়ান্ত আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে ভেঙে পড়ছে বধূর অপ্রত্যাশিত রূঢ় হিংস্র ব্যবহারে—এই থিমকে কেন্দ্র করে জীবনানন্দ - 'বাসররাত'; 'কুষ্ঠের স্ত্রী'; 'সুখের শরীর'; 'বাসর শয্যার পাশে'; 'বাসর ও বিচ্ছেদ'; 'নষ্ট প্রেমের কথা' প্রভৃতি বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন।

কুষ্ঠের স্ত্রী ঃ এই ছোটগল্পটিতেও বাসররাত থেকেই নববধূর অমার্জিত, হিংস্ররূপ দেখা গেছে। সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলে সুশোভন অত্যন্ত মার্জিত, ভদ্র, কোমল, সৌন্দর্য প্রিয়, প্রেমিক প্রকৃতির মানুষ। এক দুর্ঘটনায় পুড়ে যাওয়া সাদা দাগ আজও তার মুখে বর্তমান। ফলত কোনো সুন্দরী মেয়েই এই দাগের জন্য সুশোভনকে পছন্দ করে না। অবশেষে অতসী নামে এক বাপ-মা মরা মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে স্থির হয়।

বিয়ের রাতে সারা মুখে চন্দন থাকায় সুশোভনের মুখের সাদা দাগ ঢেকে যায়। অতসী তাই বুঝতে পারে না। বাড়িতে বধূকে নিয়ে চলে আসে সুশোভন। মুখ ধুয়ে ফেলায় পুনরায় মুখের সাদা দাগ বেরিয়ে পড়ে। অতসী যখন ঘরে আসে তখন

সন্ধ্যা—ঘর অন্ধকারাচ্ছন্ন। অন্ধকার ঘরেই নবদম্পতি কথাবার্তা চালায়। অনাথ দরিদ্রঘরের অল্পশিক্ষিত মেয়ে অতসী নিজের বাপের বাড়ি তার স্বামীর পরিবারের চেয়ে যে কত উচ্চস্তরের তা নানাভাবেই অতিরঞ্জিত করে শোনায়। কীভাবে গলবস্ত্র হয়ে দিনের পর দিন ধরনা দিয়ে সুশোভনের জ্যাঠা তার মামার থেকে অতসীকে পছন্দ করে এ বাড়ির বৌ করে নিয়ে এসেছে—এই মিথ্যাচার চালিয়ে যায় অতসী। একের পর এক এ মেয়ের অমার্জিত, অশিক্ষিত, অতিরঞ্জিত কথাবার্তা শুনে যায় সুশোভন। বাড়ির পিসিমা, কাকিমা, জেঠিমারাও যে দিনের বেলা এ মেয়ের ব্যবহারে বীতশ্রদ্ধ হয়েছে তা বুঝতে পারে সুশোভন।

পরের দিন সকালবেলা ঘটনা অন্যদিকে মোড় নিল। বিয়ের পর এই প্রথম বর ও বধূ একে অপরকে ভোরের আলোয় স্পষ্টভাবে দেখল। অতসী সুশোভনের মুখের সাদা দাগ দেখে আঁৎকে ওঠে, দাগগুলিকে সে কুষ্ঠ বলে ঠাওরায়। যদিও অতসীর মামা এ দাগের কথা জানত ও তা দেখেওছে, তবু অতসী বলে তার মামাকে ঠকান হয়েছে, তার পরকাল নষ্ট করা হয়েছে। সুতরাং তার সমস্ত সম্পত্তি তাকে লিখে দিতে হবে।

অপরদিকে সুশোভন অতসীর কদাকার মুখ দেখে ভাবতে থাকে এ জীবনে তার সৌন্দর্যবোধ আর তৃপ্ত হল না, অতসীর অত্যন্ত কুৎসিত এক রূপের বর্ণনা দিয়েছেন লেখক—সুশোভন তাকিয়ে দেখলে, অতসীর দুপাটি দাঁতের ক্ষয় ধরেছে। হাসলে শিঁটে মাড়ি বেরিয়ে পড়ে। দাঁতগুলো এমন নোংরা যে অতসীর মুখের ভিতরটা পায়খানার গহ্বরের মতে একটা গভীর বিকৃত রাজ্য যেন উঁচু-নিচ ছোট-বড় জামের বিচির মত আবর্জনার ভেতর ছোট বড় প্রেতযোনিকে নিয়ে একটা কুম্ভীপাক। সেদিকে তাকাতে ঘৃণা লাগে, ভয় লাগে। অত্যন্ত ব্যথা বোধ হয়। (৮ম খণ্ড, পৃ. ১৩৯)। স্বাভাবিকভাবেই একে অপরের প্রতি কোনো প্রণয় বা রোমান্স অনুভব করে না। তবে সুশোভন তার শালীনতাকে বধূর মত ভাঙে না।

ক্রমে অতসী নিজের কদাকার রূপ অনুভব করে। অতসীর কোনো সৌন্দর্যবোধ নেই, রূপের মর্ম সে বোঝে না। সে সুশোভনকে জানিয়ে দেয় সে তার মুখের সাদা দাগকে মেনে নিতে পারবে। অতি সাধারণ 'মেয়েমানুষ' বলেই অতসী বহুক্ষণ বিমর্ষ হয়ে থাকতে পারে না। তার হৃদয়ে কামনা, কল্পনা প্রতিভার স্পৃহা নেই। অতি সাদাসিধে জিনিসেই সে তৃপ্ত। ফলত এ বিয়েতে গভীরভাবে বিমর্ষতা সুশোভনের হৃদয়েই জেগে রইল - এ জীবনে তার সৌন্দর্যবোধ আর তৃপ্ত হবে না।

(ঘ) বেকারত্ব ঃ অস্তিত্বের আত্মসংকট

জীবনানন্দ বেকারত্বকে থিম করে বেশ কিছু গল্প লিখেছিলেন। মূলত নিজের ব্যক্তিজীবনের কিছু অভিজ্ঞতা এবং সংবেদনশীল মানুষ হিসাবে সমকালীন সময়ের কাজের জগতের মন্দা, শিক্ষিত যুবকের আত্মগ্লানি ইত্যাদি পর্যবেক্ষণ লব্ধ অভিজ্ঞতা এক্ষেত্রে থিম হিসাবে এসেছে। এই জাতীয় গল্পগুলিতে দেখা যায়, প্রধান চরিত্র সাধারণত ইংরেজিতে এম.এ এবং সেই ডিগ্রিকে বহন করে সে নিজের জীবনকে স্বচ্ছলভাবে চালিয়ে নিতে ব্যর্থ হচ্ছে। নানা ধরনের ব্যাবসা করে নানাস্থানে চাকরির সন্ধানে ঘুরে ঘুরে কেবলমাত্র ব্যর্থতাকেই পুঁজি করতে পেরেছে। স্ত্রী-সংসার প্রতিপালনে চূড়ান্তভাবে ব্যর্থ বেকার যুবক কলকাতার মেসে দিনগুজরান করছে, কখনও বা অন্য প্রদেশে বসবাস করছে। বেঁচে থাকার এই লড়াই-এ বেকার যুবক চূড়ান্ত অস্তিত্ব সংকটের মুখোমুখি। স্বাভাবিকভাবেই বেকারত্বকে থিম করে তিনি যে সকল গল্প লিখতে গেছেন সেখানে ব্যক্তিজীবনের এই সকল অভিজ্ঞতা, নিজের আত্মসংকট, পরিবার পরিজনের ধিক্কার ইত্যাদি প্রসঙ্গ গল্পগুলিতে প্রবলভাবে এসেছে—'সমুদ্রের স্রোতের মতো'; 'নিরুপম যাত্রা'; 'পালিয়ে যেতে'; 'মেয়ে মানুষদের ঘ্রাণে'; 'চাকরি নেই' ইত্যাদি গল্পে বেকারত্ব, অস্তিত্বের লড়াই ও নায়কের আত্মসংকট থিম হিসাবে গৃহীত হয়েছে।

নিরুপম যাত্রা ঃ গত শতকের ত্রিশের দশকে বেকার যুবকের আত্মগ্লানির আর এক উজ্জ্বল দলিল হল 'নিরুপম যাত্রা'। স্ত্রী-পুত্র-সংসারকে দেশের বাড়িতে ফেলে কেবলমাত্র একটা চাকরি সংগ্রহের জন্য দীর্ঘদিন ধরে কলকাতায় মেসজীবন কাটাচ্ছে প্রভাত—কিন্তু কাজের কোনো সন্ধান সে পেল না। অবশেষে দেশে ফেরার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কলকাতায় কাজের জগতের মরীচিকা তার দিগ্‌ভ্রম ঘটায়—বারেবারে সে বাড়ি যাবার চেষ্টা করেও যেতে পারেনি। বেকার জীবন, কলকাতার সহানুভূতিহীনতা, চিঠিতে বধূর তীক্ষ্ণ শ্লেষ ও ক্ষোভ প্রভাতকে নিদারুণভাবে আত্মসংকটের দিকে ঠেলে দেয়—বর্তমান

জীবন তার কাছে দুর্বিষহ হয়ে ওঠে - বর্তমানের কঠোর বাস্তবকে ভুলতেই সম্ভবত গ্রামজীবনের নস্টালজিক ফিলিং - এ সে বারেবারে আক্রান্ত হয় - ফিরে যেতে চায় বারবার সেই জীবনে - তাই সারা গল্পটিতেই আছে ফ্ল্যাসব্যাকে তার অতীতজীবন, গ্রামের জীবন, গ্রামজীবনের সঙ্গে তার আত্মীয়তা, প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্যের বর্ণনা। প্রভাতের মানসিক আনন্দের এইসব অসাধারণ বর্ণনাগুলি এসেছে মূলত তার বেকার জীবনের গ্লানিকে, ব্যর্থতাকে ঢেকে দেবেরা জন্য, ভুলে থাকার জন্য।

বন্ধু তারাপদর থেকে একদিন কুড়ি টাকা ধার করে প্রভাত। কলকাতার সব পাওনাগন্ডা মিটিয়ে মা-স্ত্রী-পুত্রের জন্য কেনাকাটা করে দেশের বাড়ি ফেরার জন্য সমস্ত জিনিস গুছিয়ে ফেলে সে। এমনই সময় তার পরিচিত কার্তিকবাবুর সূত্রে একটি ছেলে তার কাছে আসে - তিন মাসের জন্য তাকে টিউশন পড়াতে হবে। প্রভাত নিজের অক্ষমতার কথা জানালে ছেলেটির ভাবনায় সমকালীন সমাজের এক নিদারুণ ছবি ভেসে ওঠে—"সামান্য একটা টিউশন পাবার জন্য কাঠ পিঁপড়ের মতো মানুষের দঙ্গল কতবার তাদের বাড়ির দেউড়িতে ধরনা দিয়েছে কলকাতা শহরের আধাআধি লোকের মাথা তার ভিতর খুঁজে পাওয়া যায়;" (৩য়, খণ্ড, পৃ. ১২৭)। অবশেষে কার্তিক এসে তাকে জোরাজুড়ি করায় প্রভাত ত্রিশ টাকা মাইনের টিউশনের জন্য দেশে যাওয়া স্থগিত রাখল। তিনমাস শেষ হলে তার ছাত্রের অনুরোধে প্রভাত ছাত্রের বাবার স্কুলে মাস ছয়েকের জন্য মাস্টারি চাকরি নেয়। প্রভাত ছিল ইংরেজিতে এম.এ, কিন্তু স্কুলে তাকে ইংরেজি ছাড়া অন্য বিষয়াদিই পড়াতে হয় মূলত।

প্রভাত কোনো স্থায়ী চাকরি জোটাতে পারেনি - দেশের গাছপালা, কুকুর, পুকুর, মা, স্ত্রী, খোকা সকলের জন্য তার মন কেমন করে। প্রভাত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে। একদিন স্কুল থেকে জ্বর গায়ে মেসে ফিরে আসে। মেসে ফিরেই প্রভাত ঠিক করে সে দেশে ফিরে যাবে।

বাক্স বিছানা বাঁধতে বাঁধতে প্রভাত 'জীবন' সম্পর্কে অনেক গভীর সব কথা ভাবতে থাকে। তার কিছু ভাবনাকে আমরা এখানে উদ্ধৃত করতে পারি—

ক. .... মানুষ যদি এক মুহূর্ত অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে তা হলে জীবন তাকে মনে করে অপদার্থ শব, সময় আসে শকুনের মতো উড়ে, তাই আসে—তাই আসে। (ঐ, পৃ. ১৩৪)

খ. সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা; ভালোবাসার চেয়ে সফলতাকে তারা ভালোবাসে বেশি—আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি। যে যা ভালোবাসে সেই জিনিশেরই আরাধনা করা উচিত তার। (ঐ,পৃ.১৩৫)

গ. জীবন হচ্ছে লড়াইবাজ বাজপাখির বিশাল আকাশ এবং সংগ্রাম উচ্ছল, আশানীলাভ বিরাট পরিবিস্তৃত আকাশের মতো এই জীবন। যারা দুর্বল তারা পিছিয়ে পড়ে, মায়া মমতার দোহাই পাড়ে—জীবনের ভিতর বিধাতার খেলা দেখে শুধু—অনিয়ম দেখে—উচ্ছৃঙ্খলতা দেখে—তা নয়—তা নয়। (ঐ, পৃ. ১৩৫)

এমনই সব ভাবনা ভাবতে অবশেষে "সংসারের বাজপাখি নয়, চড়ুই পাখি - শালিখ পাখি এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রাম নিষ্পেষিত যুবক ক্রমে ক্রমে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়তে লাগল"। (ঐ, পৃ. ১৩৫) সে মারা গেল। তার অসুখের খবরও কেউ জানল না। মৃত্যু অবধি সে নিজের কাজ নিজেই করল—এখন সে অন্যের বোঝা। আত্মীয় স্বজন-পরিজন কেউ নেই—মেসের আবাসিকবৃন্দ দ্রুত নিজের কাজে বেরিয়ে গেল। সারাদিন মৃতদেহ একটা ঘরের মধ্যে পড়ে রইল, এই নিদারুণ মৃত্যুর করুণ বর্ণনায় গল্প সমাপ্ত হয়—"প্রভাতের রুদ্ধঘরে মাছির ভনভনানি, অসহ্য গুমোট ও মশা এক এক সময় মৃতের পক্ষেও যেন অসহ্য হয়ে ওঠে—পৃথিবীর বাজপাখির নয়—চড়ুই পাখি, শালিখ পাখি, এই উদাসী, করুণ, সংসারের কর্তব্য সংগ্রামে নিষ্পেষিত বন্ধনাত্মা যুবক কোনোদিন তার প্রমত্ততম কল্পনায় মনে করে নি যে এই মেসে সে মরবে—তার মৃত্যুর পর মেসের একটা দিন এই রকম কেটে যাবে—এই মেসের কয়েকটি বাবু সিগারেট আর পানের ডিবে নিয়ে রাতে নিমতলায় তাকে পোড়াতে যাবে—" (ঐ, পৃ. ১৩৭)

বাংলা সাহিত্যের অন্যতম একটি সেরা গল্প হিসাবে চিহ্নিত হবার দাবি রাখতে পারে 'নিরুপম যাত্রা' গল্পটি। একজন পরাভূত বেকার যুবকের আত্মগ্লানিময় অসহায় করুণ জীবনচিত্র গল্পটিকে অশ্রুজলে আর্দ্র করে তুলেছে। তাছাড়া গল্পটির একটি বড় সম্পদ হল তার সংগঠন (structure) ও ভাষার প্রকাশমানতা (expressiveness)।

(ঙ) শিল্প-সাহিত্য সংক্রান্ত ঃ শিল্প সাহিত্যকে থিম করে জীবনানন্দ বেশ কিছু উল্লেখযোগ্য গল্প লিখেছেন। মূলত সাহিত্যকেই অধিক অবলম্বন করেছেন। 'তাজের ছবি' নামে একটি গল্পে একজন ব্যর্থ চিত্রশিল্পীর কাহিনি বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অন্য কোনো শিল্প বিষয়ে তাঁর বিশেষ কোনো গল্প নেই। আর সাহিত্যকে অবলম্বন করে যে-সকল গল্পগুলি লিখেছিলেন সেখানে জীবনানন্দের শিল্পীমানসের নানা দিকের পরিচয় ধরা পড়েছে। নিজের নানা ভাবনা চিন্তা, দর্শন, কামনা, বাসনা ইত্যাদি যেমন একদিকে ধরা পড়েছে, তেমনি সাহিত্য সৃষ্টির জন্য ব্যক্তিজীবনের নানা সংকট, স্ত্রীর থেকে দূরত্ব, পরিচিত-পরিজনের থেকে বিচ্ছিন্নতা, আর্থিক দুর্গিতি, প্রচার না পাওয়ায় কষ্ট, বোদ্ধা পাঠকের অভাব, তাদের শিল্পবোধের অভাব প্রাসঙ্গিকভাবে স্থান পেয়েছে ঐ সকল গল্পে—'তাজের ছবি'; 'মনোবীজ'; 'আর্টের অত্যাচার'; 'কবিতা আর কবিতা, তারপরেও আবার কবিতা'; 'করুণার রূপ'; নক্ষত্রের বিরুদ্ধে মানুষ ইত্যাদি গল্পে শিল্প সাহিত্য সংক্রান্ত থিম স্থান পেয়েছে।

তাজের ছবি ঃ স্বপ্ন ও বাস্তবের দ্বন্দ্ব একজন শিল্পীর জীবনে যে নিদারুণ পরিণতি ঘনিয়ে তুলেছে তারই ছবি ফুটে উঠেছে এই গল্পে। শ্রীবিলাসবাবুর পুত্র বিজন অত্যন্ত স্বচ্ছলভাবেই বড় হয়ে উঠেছে—ছোটবেলার থেকেই কোনো দরকারি অদরকারি অভাব বা খাওয়া পড়ার সমস্যা অনুভব করতে না হওয়ায় নানা বিচিত্র বিষয় নিয়ে ভাবার ঢের অবসর পেয়েছে তার মন। অত্যন্ত স্বতঃস্ফূর্ত ও সপ্রতিভ এই যুবকটি জীবনে চিত্রশিল্পী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হতে চায়—এটাই তার স্বপ্ন।

শ্রীবিলাসবাবু পুত্রের জন্য একটি পঁচাত্তর টাকা মাইনের চাকরির ব্যবস্থা করে - কিন্তু বিজন তা গ্রহণ করতে রাজি নয়। কারণ চিত্রশিল্পী বা যে-কোনো শিল্পীর জীবনেই "ঐকান্তিকতার দরকার"—চাকরি, প্রেম, বিবাহ, সংসার, সাংসারিক দায় ইত্যাদি শিল্পীর 'ঐকান্তিকতা'কে নষ্ট করে দেয় বলে সে মনে করে। এহেন বিজনের জীবনে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে দেখা জনৈক ইউলিয়াম ড্যানিয়েলের আঁকা একশ বছরের পুরনো তাজমহলের একটি ছবি এক গভীরতর প্রভাব ফেলল। তার এক মহিলা বন্ধু, মাধবীর সঙ্গে সে ঐ ছবিটি নিয়ে আলোচনা করে এবং আগ্রায় গিয়ে তাজমহলের একটি ছবি আঁকার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এই মাধবী মনে মনে বিজনকে ভালোবাসে। কিন্তু বিজন তা বুঝতে চায় না। মাধবী বিজনকে তাজমহলের ছবি আঁকার ব্যাপারে একটি পরিকল্পনা দেয়। মাধবীর পরিকল্পনা মতো বিজন ভোরের, জ্যোৎস্নার এবং বর্ষণসিক্ত দিনের—এই তিন ধরনের তাজমহলের ছবি আঁকার জন্য আগ্রা যাবার প্রস্তুতি নেয়।

এরপর বিজন আগ্রায় পৌঁছাল। কিন্তু ঘোর বর্ষাকালেও সেখানে ফুটফুটে চড়া রোদ থাকায় বর্ষণসিক্ত তাজের ছবি আঁকা তৎক্ষণাৎ হয় না। বাধা হয়েই তাকে সেখানে বৃষ্টির জন্য অপেক্ষা করতে হয়। পিতৃবন্ধু জানকীবাবুর বাড়িতে গিয়ে ওঠে বিজন। একদিন মধ্যরাত্রে জানকীবাবুর মেয়ে সন্ধ্যা বিজনকে ডেকে দেয়—বৃষ্টি নেমেছে—বর্ষণসিক্ত তাজের ছবি আঁকার জন্য। এই সন্ধ্যাও বিজনকে মনে মনে ভালোবেসে ফেলে। কিন্তু বিজন তাকে গুরুত্ব দেয় না।

অবশেষে তাজরে তিনরূপের ছবি এঁকেই বিজন দেশে ফিরল। কিন্তু প্রতিষ্ঠিত ছবি বিশেষজ্ঞরা তার ছবিকে বিশেষ কোনো মূল্য দিল না। সকলের কাছেই মনে হল তার ছবি একান্তভাবেই ছেলেমানুষী মাত্র।

এভাবেই বিমর্ষতার মধ্য দিয়ে তার দিন চলে যায়। ইতিমধ্যে বিজনের বাবা মা মারা গেছেন। বাবা তাঁর ঋণ শোধ করতে গিয়ে ছেলের জন্য আর কিছুই রেখে যেতে পারেনি। আজ তার শিল্পী হবার সব সাধ ফুরিয়েছে—আজ তাকে মেসজীবন কাটাতে হচ্ছে। আজ সে বিয়ে করে সংসারী হতে চায়। মাধবীকে সে চাইল জীবনসঙ্গিনী করতে—কিন্তু ইতিমধ্যেই তার ভালোবাসার পাত্রী মাধবী অন্যত্র বিবাহ করেছে, তার দুটি সন্তান হয়েছে। সন্ধ্যার খবর নেবার জন্য জানকীবাবুর কাছে চিঠি লিখল—জানল তারও বিয়ে হয়ে গেছে। মেসে ফিরে এসে দেখল তার অন্য তিনজন রুমমেট মেসঘরের যত্রতত্র থু থু নোংরা ফেলে এক কদর্য পরিবেশ তৈরি করে ফেলেছে। বিজন তাদের এই কাজে বাধা দিতে পারল না—জানল তারা চাকরি করে, মাইনে পায়—বাস্তব জীবন ব্যর্থ শিল্পীর চেয়ে চাকুরিজীবীকে অনেক বেশি গুরুত্ব

দেয়। সুতরাং বাধা দিয়ে কোনো লাভ নেই। শিল্পী হবার বাসনাতেই একদা সে হেলায় এসবকে তুচ্ছ করেছিল। আজ তাই তার কাছে দুর্লভ হয়ে দেখা দিয়েছে।

অর্থের অভাব, বেকারত্ব, সাংসারিক বুদ্ধির অভাব যেভাবে ব্যক্তিজীবনে জীবনানন্দের শিল্পীসত্তাকে বারবার আঘাত করেছে—নিজের কল্পনাবোধ, হৃদয়বৃত্তি, বিষয়বুদ্ধিহীন শিল্পী মানসিকতা, শিল্পশিক্ষা বিষয়ে গভীর ভাবনা, নিজের শৈল্পিক-নান্দনিক পর্যবেক্ষণ বাইরের পৃথিবী দ্বারা নির্বোধের মতো প্রত্যাখ্যাত হয়েছে—তাই যেন জীবনানন্দকে প্ররোচিত করেছে এমন নির্মম ব্যর্থ শিল্পীর কাহিনি রচনায়।

(চ) শিক্ষক জীবন ঃ ব্যক্তিগত জীবনে জীবনানন্দ স্বয়ং একজন কলেজ শিক্ষক ছিলেন। তাঁর পিতাও ছিলেন একজন স্কুল শিক্ষক। ফলে একটা পারিবারিক ঐতিহ্য এ বিষয়ে ছিলই। জীবনানন্দ অনেক প্রবন্ধ (‘শিক্ষার কথা’; ‘শিক্ষা-দীক্ষা’; ‘শিক্ষা-দীক্ষা-শিক্ষকতা’), উপন্যাস (‘জলপাইহাটি’) ও ছোটগল্প (‘ঐকান্তিক অতীত’; ‘ক্ষমা অক্ষমতার অতীত’; ‘স্বপ্নের ভগ্নস্তূপ’; ‘বাইশ বছর আগের ছবি’; ‘শীতরাতের অন্ধকারে’; ‘এক সেতুর ভিতর দিয়ে’ ইত্যাদি)-এর বিষয়বস্তু হিসাবে তাই শিক্ষা ও শিক্ষক জীবনকে অবলম্বন করেছিলেন। আর প্রায় সর্বত্রই শিক্ষক জীবনের আর্থিক অসঙ্গতিজনিত সংকট, মর্যাদাহীনতা, কাজের অসন্তুষ্টি (Job dissatisfaction), কাজের অনিশ্চয়তা ইত্যাদি এই সকল বিষয়গুলি ঘুরেফিরে গুরুত্বের সঙ্গে বর্ণিত হয়েছে।

ঐকান্তিক অতীত ঃ হেডমাস্টার বরদাবাবুর সঙ্গে তাঁর স্কুলের নবনিযুক্ত একজন শিক্ষকের কথোপকথন দিয়েই গল্পটির শুরু ও সমাপ্তি। গল্পটিতে কোনো বর্ণনা প্রায় নেই বললেই চলে। কোনো ঘটনাও নেই। দু’জন মানুষের মানসিক জগতের বৈপরীত্যই ফুটে উঠেছে কথোপকথনের মধ্য দিয়ে।

কোনো ঘটনা না থাকায়, কথোপকথন যেভাবে এগিয়েছে তারই আলোচনার মধ্য দিয়ে দু’জন শিক্ষকের মানসিক জগৎটাকে চিনে নেওয়া যেতে পারে। নবনিযুক্ত শিক্ষক ভদ্রলোক ইংরেজি সাহিত্যে এম.এ এবং দু’বছর কলেজে শিক্ষকতার অভিজ্ঞতা থাকা সত্ত্বেও স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ানোর দায়িত্ব পান না। হেড মাস্টার বরদাবাবু তাঁকে স্কুলের প্রাথমিক বিভাগে অর্থাৎ ওয়ান-সিক্স ক্লাসে পড়াতে বলেন। এই নিয়েই কথোপকথন শুরু হয়। বরদাবাবু ক্রমাগত তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা, তাঁর কলেজে পড়ানোর অভিজ্ঞতা, তাঁর সাহিত্যবোধ ইত্যাদি নিয়ে নানারকম অমার্জিত টিপ্পনি কেটে চলেন। কথায় কথায় সাহিত্য প্রসঙ্গ এসে পড়লে বরদাবাবুর অদ্ভুত ধ্যানধারণার আরো পরিচয় পাওয়া যায়। বরদাবাবু মনে করেন ইংরেজি সাহিত্য দাঁড়িয়ে আছে ডিকেন্স, স্কট ও টেনিশনের উপরেই। অথচ তিনি লরেন্স বা এলিয়টের নাম পর্যন্ত শোনেননি। বরদাবাবু নিজেকে সাহিত্যিক বলে মনে করেন—যদিও তার সাহিত্যচর্চা নোট বা ম্যানুয়াল লেখাতেই সীমাবদ্ধ। আর তাতেই শিক্ষক ভদ্রলোক মনে মনে ভাবতে থাকেন—“এ লোকটি কোন দেশে থাকে, আমাদের বাঙালিদের মধ্যে সাহিত্যিক জীবন সাহিত্য সাধনা বলতে (....) একখানা নোট, তা যতই ভালোই হোক, তার কথা কেউ কীভাবে!” (১০ম খণ্ড, পৃ. ৫৬)।

বরদাবাবুর অদ্ভুত সব ভাবনাচিন্তা, অদ্ভুত সব আচরণ। নতুন শিক্ষক ইংরেজির লোক হওয়া সত্ত্বেও তাকে অঙ্কের বই লেখার পরামর্শ দেন, অঙ্ক ও ভূগোল পড়াতে দেন। বর্তমানের সমগ্র নতুন প্রজন্মকেই এই বর্ষীয়ান বরদাবাবু অপদার্থ বলে মনে করেন। নতুন শিক্ষকের যাবতীয় কাজেরই তিনি সমালোচনা করেন। তাঁর ইংরেজি সাহিত্য নিয়ে পড়া, বেকার জীবনে টিউশন করা, তাঁর উঁচু ক্লাসে ইংরেজি পড়ানোর ইচ্ছা, এমনকী সে বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেও বরদাবাবু তার প্রতি বিরোধী মনোভাব পোষণ করেন।

তবে গল্পের শেষের দিকে বোঝা যায় বরদাবাবুর মধ্যে একটা প্রবল শূন্যতাবোধ বা নৈরাশ্য (nothings) কাজ করছে। শৈশবের ও যৌবনের আদর্শ স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা কোনো কিছুই পূরণ হল না। তাই পরিণত বয়সে নিজের শক্তির ও প্রতিভার ‘সুন্দর প্রকাশ’ ও ‘সদ্ব্যবহার’ করেন নোটবই লিখে। নোটবইয়ের প্রশংসা শুনে পরিতৃপ্তি ও প্রসন্নবোধ করেন। অন্যদিকে জগতের নতুন সবকিছু সম্পর্কে রয়েছে একটা নঞর্থক ধারণা। তবে সংলাপের মধ্য দিয়ে বরদাবাবুর মানসিক জগৎ যতটা

উন্মোচিত হতে পেরেছে নতুন শিক্ষকের ততটা নয়। অবশ্য এটা ধরা পড়ে যে নতুন শিক্ষকের আধুনিক জীবন ও সাহিত্যবোধ, শিক্ষাগত যোগ্যতা, রুচিবোধ ইত্যাদি ছিল খুবই উচ্চস্তরের—কিন্তু তার মূল্য তিনি পেলেন না। বরদাবাবুর মতো অদ্ভুত ধ্যানধারণাসম্পন্ন একজন হেডমাস্টারের অধীনে তেকে তার মন যুগিয়ে চলতে হবে সারাটা জীবন - ফলে একটা শূন্যতাবোধ (nothings), নিষ্ফলতা ভবিষ্যতে তাকেও গ্রাস করতে পারে—এমন একটা ইঙ্গিত ও ব্যঞ্জনা সংলাপের মধ্য দিয়ে ফুটে ওঠে।

প্রথমত , নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে কৌণিক বিপ্রতীপতার সংগঠন লক্ষ করা যায়।

দ্বিতীয়ত, নর-নারীর সম্পর্কের সংগঠনে অনেকক্ষেত্রে ভারসাম্য (balance) ভেঙে যাচ্ছে—তৈরি হচ্ছে নিঃসীম শূন্যতা (nothingness)-র বোধ।

তৃতীয়ত, নর-নারীর সম্পর্কের সংগঠনে ভারসাম্য ও রয়েছে—এক্ষেত্রে একটা ইতিবাচক দিক তৈরি হচ্ছে।

চতুর্থত, অনেক গল্পেই শূন্য কাহিনিবৃত্ত রয়েছে—কোনো কাহিনিবৃত্ত গড়ে ওঠেনি—কোনো ঘটনা নেই। এক্ষেত্রে সংগঠনে চরিত্রায়ণই হয়ে উঠেছে মুখ্য।

পঞ্চমত, কিছু গল্পে চরিত্রায়ণের সংগঠনে শূন্যতাবোধও তৈরি করা হয়েছে।

ষষ্ঠত, অনেক গল্পে প্রেম ও অপ্রেমের বৈপরীত্য তৈরি হয়েছে।

সপ্তমত, প্রেম-অপ্রেম এই টেনশনের মাধ্যমে একটা nothingness তৈরি হয়েছে।

অষ্টমত, কিছু গল্পে বর্তমানের সংকটের মোকাবিলা করতে ফ্ল্যাসব্যাকে অতীত থেকে জীবনরস সংগৃহীত হচ্ছে—এইভাবে একটা ভারসাম্যের সংগঠন তৈরি করা হয়েছে।

নবমত, বর্তমানের সাহিত্য আবহাওয়ার সঙ্গে কবি প্রতিভার দ্বন্দ্ব বা বিপ্রতীপ অবস্থান কিছু গল্পে শূন্যতাবোধ তৈরী করেছে।

দশমত, অনেক গল্পে মানসিক জগতের কোনো দ্বিধা দ্বন্দ্ব জটিলতা না থাকায়—কোনো ঘটনা না ঘটায়—থিমের সংগঠন একান্তভাবেই ফ্ল্যাট হয়ে গেছে।

সহায়ক তথ্যসূচী ঃ

১. মলয় রায় চৌধুরী, 'হাঙরের ঢেউ', অন্তর্গত শর্মী পাণ্ডে (সম্পা), ২০০০, 'কারুতান্ত্রিক জীবনানন্দ', কলকাতা, গ্রাফিত্তি, পৃ. ৪২।

২. প্রতিভা বসু, 'জীবনানন্দ' অন্তর্গত, সুধীন বসু (সম্পা), ২০০২, ভাবনা ঃ জীবনানন্দ, কলকাতা বালার্ক, পৃ. ১৫৬।

৩. ভূমেন্দর গুহ ''জীবনানন্দ দাশের দিনলিপি বা Literary Notes - সেপ্টেম্বর ১৯৩১'' অন্তর্গত 'বিভাব' পত্রিকা, ১৯৯৮-৯৯, জীবনানন্দ জন্মশতবর্ষ স্মরণ-সংখ্যা, পৃ. ৩৫৯।

৪. মলয় রায়চৌধুরী, 'হাঙরের ঢেউ' অন্তর্গত সুধীন বসু (সম্পা), ২০০০, ভাবনা ঃ জীবনানন্দ, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১২১।

৫. তদেব, পৃ. ১২১।

৬. জীবনানন্দ দাশ, 'Bengali Novel Toady' পুনর্মুদ্রণ, অন্তর্গত 'বিভাব' পত্রিকা, ১৯৯৮-৯৯, পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ১৮৫-৮৬।

৭. মলয় রায়চৌধুরী, 'হাঙরের ঢেউ', অন্তর্গত সুধীন বসু (সম্পা), ২০০২, ভাবনা ঃ জীবনানন্দ, পৃ. ১২১।

ড. মাধুরী বিশ্বাস
সহকারী অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ,
কৃষ্ণনাথ কলেজ, মুর্শিদাবাদ।

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণ

ড. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের কথাসাহিত্য, বিশেষতঃ ছোটগল্প বিষয় বৈচিত্র্যে সুপ্রচুর। বৈচিত্র্য-সন্ধানী এই লেখক তাঁর ইতিবাচক প্রসন্ন জীবন পর্যবেক্ষণের দৃষ্টি নিয়ে একসময় সকৌতুকে ঢুকে পড়েছেন শিশুজগতের অন্দরমহলে, আর খুঁজে পেয়েছেন সেইসব আলোকিত কুঠুরি যেখানে সহজ-স্বাভাবিক প্রাণপ্রাচুর্যের সতেজ বাতাস বহমান।

রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'সাহিত্য' গ্রন্থে লিখছেন—"এমন সৌভাগ্যবান লোকও আছে যাঁহাদের বিস্ময় এবং কল্পনা সর্বত্র সজাগ, প্রকৃতির কক্ষে কক্ষে তাঁহাদের নিমন্ত্রণ; লোকালয়ের নানা আন্দোলন তাঁহাদের চিত্তবীণাকে নানা রাগিণীতে স্পন্দিত করিয়া রাখে। বাহিরের বিশ্ব ইঁহাদের মনের মধ্যে হৃদয়বৃত্তির নানা রসে, নানা রঙে, নানা ছাঁচে নানারকম করিয়া তৈরি হইয়া উঠিতেছে।"[১] বিভূতিভূষণের বৈচিত্র্যপ্রিয় সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই সাহিত্যতত্ত্বের মতামত খুবই প্রাসঙ্গিক। দেখা যায়, নানা পরিবেশের নানা বয়সের ও বিভিন্ন চরিত্রের নরনারী তাঁর ছোটগল্পে বেছে নিয়েছেন বিভূতিভূষণ, আর শিশুমহলে যখনই ঢুকেছেন এক নতুন জগৎ আবিষ্কারের সন্ধানী হয়েছে তাঁর বৈচিত্র্যপ্রিয় মন।

১

লেখকের নিজের কথা ও তাঁর সম্পর্কিত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় তিনি ছিলেন ঋজু, শান্ত, স্থিতধী, রসবোধে পূর্ণ স্নেহ মমতাশীল মানুষ। লেখকের ব্যক্তি জীবনের আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রী সরোজ দত্তের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রাসঙ্গিক। প্রাবন্ধিক লিখছেন "... আর্থিক কৃচ্ছ্রতার সঙ্গে প্রতিনিয়ত সংগ্রাম, বৃহৎ যৌথপরিবারের দায়ভার, পুনঃপুনঃ 'রাজ'-সান্নিধ্য এবং প্রায়শঃ শিক্ষকতা তাঁর চরিত্রকে অতিমাত্রায় ঋজু এবং পরিমার্জিত করেছে। সেই সঙ্গে পারিবারিক সূত্রে পেয়ে গিয়েছেন তাঁর প্রবাদপ্রতিম আতিথ্যধর্ম আর শম-দম-তিতিক্ষার শিক্ষা—শুচিস্নিগ্ধ নৈতিক ব্রাহ্মণ পরিবারের প্রাণপ্রবাহ, আর আয়ত্ত করেছেন ক্ষমা, অসূয়াহীনতা, প্রীতি-বাৎসল্যের মতো গুণাবলী।"[২] এই ব্যক্তিচরিত্রের প্রতিফলন দেখা যায় তাঁর লেখক সত্তার মধ্যেও। জীবনের বিশাল পরিব্যাপ্তিতে যে বিচিত্র মানুষ, বিচিত্র পরিবেশ, বিচিত্র মন সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা হয় প্রত্যেককেই তার নিজস্ব ভূমিতে রেখে পর্যবেক্ষণ করেছেন লেখক। মানুষের আচরণের পেছনে যে দীর্ঘদিনের গড়ে ওঠা পরিবেশের প্রভাব, তার নিজস্ব চরিত্রকাঠামোর প্রভাব সবসময় কার্যকরী—এ কথা লেখক নিজের সহিষ্ণু স্বভাববৈশিষ্ট্য থেকে বুঝেছিলেন। আর এই জীবনদরদী লেখক তাঁর বিশেষ কিছু গুণ নিয়ে যখন প্রবেশ করেন শিশুদের রাজত্বে, বেশীক্ষণ অচেনা অতিথি হয়ে পাশে সরে থাকতে হয় না তাঁকে—অল্প সময়ে তিনি হয়ে ওঠেন তাদের নিজেদেরই একজন।

পরিণত মানুষের সচেতনতা নিয়ে, যুগ-সমস্যায় ক্ষতবিক্ষত কালের দায়বদ্ধতা স্বীকার করে ও নিজস্ব জীবনের নানা কর্মভারের ক্লান্তি মেনে, যখন চলে লেখকের সাহিত্য-সাধনা তখন কিছুক্ষণের জন্যেও এই শিশুজগতে প্রবেশ করে বিভূতিভূষণও পেয়েছেন মুক্তির স্বস্তি, তৃপ্তি। তাঁর নিজের কথায় এর প্রমাণ দেখি, "... এখানে আমার নিজের মনের গহনে প্রবেশ করা নয়, তাদের মনে যে মুক্ত আনন্দলোক সেইখানে গিয়ে দাঁড়ানো। আশ্চর্য এই যে, সে-জগৎ ভ্রান্তির জগৎ; সে-জগতে প্রবেশ করতে হলে নিজের এই বিজ্ঞ, অভিজ্ঞ সত্তাটাকে ভ্রান্তির চাদরে ঢাকা দিয়ে প্রবেশ করতে হয়। একবার গিয়ে পড়তে পারলে কিন্তু শুধুই আনন্দ আর আনন্দ। প্রশ্ন নেই, সমস্যা নেই, উত্তর নেই, সমাধান নেই। শুধু মেনে নেওয়া, হয়ে যাওয়া, ক'রে যাওয়া; কারুর কাছে কোনো জবাবদিহির বালাই নেই। সেই—'সব পেয়েছির দেশে' সবাই স্বরাট।"[৩] বিভূতিভূষণ এটাও জানেন, এই শিশুমহলে 'প্রবেশ করা কিন্তু খুব কঠিন নয়। ওদের সঙ্গে মিশে গিয়ে ওদের মনটা জানতে হয়।'[৪]

বন্দ্যোপাধ্যায়, ড. সুস্মিতা : বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ছোটগল্প ঃ বয়ঃসন্ধিক্ষণ
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 1, June 2019, Page : 25-35, ISSN 2249-4332

লেখকের শিশুচরিত্র রূপায়ণে এই মাটির জগতের শিশুরা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে জীবন্ত হয়ে ওঠে। তাদের মধ্যে কেউ চঞ্চল, কেউ স্বপ্নময়, কেউ অভিমানী, কেউ আবার নিজেদের ছোট পরিচয় অস্বীকার করে বড়দের মধ্যে স্থান পেতে ব্যাকুল, কৈশোরে পা দিয়ে এরাই কেউ হয় বেসামাল ডানপিটে, তথাকথিত সামাজিক নিয়ম-নীতি কোনো কোনো কিশোর-কিশোরীর আপন খেয়ালী জগতের কাছে হয় মূল্যহীন।

বিভূতিভূষণের শিশুচরিত্রপ্রধান ছোটগল্পে শিশুচরিত্র প্রবেশাধিকার পেয়েছে ছ'মাসেই, আর এই অবারিত প্রবেশ চলেছে কৈশোরকাল পর্যন্ত। বাল্যের স্তর পেরিয়ে কৈশোর উন্মেষের স্তরকে বলা হয় বয়ঃসন্ধিক্ষণ। শিশু তার শৈশব, বাল্যের স্তর পেরিয়ে ক্রমবিকাশের দিকে ক্রমশঃ এগিয়ে চলে, দৈহিক ও মানসিক পরিবর্তন আরও পরিণত পায় কৈশোরে। চিকিৎসাবিজ্ঞান কৈশোর-বিকাশের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে উল্লেখ করেছে—"Adolescence is a time of major physical, cognitive and psychosocial growth and change. It composes nearly half the growing period in man and is the only period of life after birth in which the velocity of growth normaly increases. It begins at about the age of 10 yr. in girls and 12 in boys. The end of adolescence varies with physical, mental, emotional, social or cultural criteria which characterize the adult."[৫] শিশুর ক্রমশঃ পরিণতি বিভূতিভূষণের হাতে রূপ পেয়েছে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিকোণ থেকে। নয়-এর ঊর্ধ্বে চোদ্দ বছর পর্যন্ত বয়ঃসীমায় কিশোর-কিশোরীর স্বভাবধর্ম লেখকের চরিত্র সৃষ্টির নৈপুণ্যে বাস্তবোচিত সজীব মাত্রা পেয়েছে।

২

নয় এর ঊর্ধ্বে শৈশব থেকে কৈশোর প্রবেশের সময় স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে প্রেমের সম্পর্ক বিষয়ে সচেতনতার বৃদ্ধি দেখা যায় লেখক-পরিকল্পিত কিশোর-চরিত্রে। কৈশোরে এই বৈশিষ্ট্যের উন্মেষ স্বাভাবিক, তা বিজ্ঞান-স্বীকৃত—"Adolescence is the period during which sexual maturation occurs and the body takes final adult form".[৬]

বিভূতিভূষণের শিশুচরিত্র প্রধান ছোটগল্পে ছয় থেকে নয় বছর বয়সী বালক-বালিকার প্রেম সম্পর্কিত ধারণা কৈশোরকালে আরও স্পষ্ট, তবে পূর্ব-অভিজ্ঞতা ও বাস্তববুদ্ধির অভাব এবং উচ্ছ্বাসময় স্বভাবধর্মের ফলে কল্পনা ও আবেগে বেশী চালিত এই বয়সী চরিত্র। বিভূতিভূষণের 'পৃথ্বিরাজ' (রাণুর প্রথম ভাগ, বৈশাখ ১৩৪৪), 'উপবাসী' (বর্ষায়, কার্তিক ১৩৪৭), ও 'আমার প্রথম গল্প' (ক্ষণ-অন্তঃপুরিকা, জ্যৈষ্ঠ ১৩৫৩) এর কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রেমের ধারণায় এই কৈশোর প্রবণতা দেখা যায়।

'পৃথ্বিরাজ' ও 'উপবাসী' গল্পে 'রসিক' ও 'রূপচাঁদ' তাদের বয়সোচিত স্বভাবধর্মে প্রেমের প্রথম অভিজ্ঞতা লাভ করে। গল্প দুটিতে কিশোর চরিত্রের মধ্যে দেখা যায় কিশোরের অ্যাডভেঞ্চার-প্রিয় মন আলাদা। গভীর অনুভূতি বা জীবনের দায়িত্ব সচেতনতায় তারা প্রেমের ক্ষেত্রে অগ্রসর নয়। তাদের ঈপ্সিত কিশোরী লাভে যখন বাধা দেখা দেয় তখন রসিক ও রূপচাঁদ দুজনের সমস্যা উত্তরণের পরিকল্পনায় কার্যকরী হয় উত্তেজনাময় স্বভাবধর্ম। নায়িকার কাছে ও সমবয়সী বন্ধুর কাছে কোনো রোমাঞ্চকর কার্যসিদ্ধির মধ্য দিয়ে নিজেদের সাহসী হিসেবে প্রতিপন্ন করার চেষ্টা আসে তাদের। নর-নারীর সম্পর্ক বিষয়ে কোন উগ্র যৌন অনুভূতির প্রকাশ তাদের মধ্যে বাহ্যত আসেনি, কিন্তু এই কিশোর চরিত্র দুটি তাদের আকাঙ্ক্ষিত প্রেয়সীর জন্য যে সচেতন অধিকারবোধ প্রয়োগ করে কিংবা তার প্রসঙ্গে যে রোমাঞ্চসুখ অনুভব করে তাকে যৌনধর্মের পরিণতির পরোক্ষ প্রকাশ বলা যেতে পারে।

'আমার প্রথম গল্প'-এ এই বয়সী কিশোরের মধ্যেও প্রেম সম্পর্কিত সচেতনতাবোধ কেন্দ্রীয় চরিত্রের গল্প লেখার প্রয়াসের মধ্য দিয়ে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক। নায়িকার উচ্ছ্বাসময় বর্ণনা, প্রেমের কাব্যিক ধারণা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে বস্তুতঃ কেন্দ্রীয় চরিত্রের মানসিকতা প্রতিফলিত। কিশোরের যৌন-অনুভূতি উন্মেষের লক্ষণ তার নায়িকা চরিত্র পরিকল্পনায় ধরা পড়ে। বাস্তব অভিজ্ঞতা বিশেষ নেই যে বয়সে সেই বয়সের আবেগ, কল্পনা, চরিত্র রূপায়ণের ক্ষেত্রে এখানেও প্রকাশিত।

৩

পরিপূর্ণ কৈশোর চিত্রিত করতে বিভূতিভূষণ কৈশোরের একটি বিশেষ স্বভাবধর্ম স্পষ্ট করেছেন, সে হল তাদের চাঞ্চল্য, একেক সময় অভিভাবক বা পারিপার্শ্বিক অন্যান্যদের কাছে যা উদ্বেগজনক মাত্রা নেয়। কৈশোরের বয়ঃধর্ম রূপায়ণে কিশোর চরিত্র বিভূতিভূষণের গল্পে বেশী দেখা যায়, কিশোরী চরিত্র সেই অনুপাতে কম। ফলে, কিশোরের চাঞ্চল্যের সঙ্গে কার্য-পরিকল্পনা এই বয়সী চরিত্র নির্মাণে বেশী দেখা যায়। নয় এর উর্ধ্বে বাল্য-কৈশোরের বয়ঃসন্ধিক্ষণে বা পরিপূর্ণ কৈশোরে শারীরিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিকশিত হয় ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠার প্রবণতা। শৈশব ও বাল্যের স্বাধীন ও স্বনির্ভর হওয়ার আকাঙক্ষা এ বয়সে আরও পরিণত রূপ পায়। তাদের মধ্যে দেখা যায় নিজস্ব বুদ্ধিতে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ঝোঁক ও নির্ভীক আত্মপ্রকাশ। কৈশোরের এই বয়ঃধর্ম সম্পর্কে চিকিৎসা-বিজ্ঞান উল্লেখ করেছে—“The quest for one’s own set of values involves gender identity, social class identity, and vocational and avocatoinal identity, and takes place increasingly in the community outside the home”.[৭]

বিভূতিভূষণের গল্পগুলিতে কিশোর চরিত্র রূপায়ণে এই বিজ্ঞান-সম্মত বয়ঃধর্ম প্রকাশিত।

‘পৃথ্বিরাজ’ গল্পের কেন্দ্রীয় রচিত্র রসিকের মধ্যে দেখা যায় দুরন্ত বালকের মানসিকতা, রোমাঞ্চজনক কাজে বেশী উৎসাহ, ভয়হীন একরেখা স্পষ্ট আত্মপ্রকাশ। এই ধরণের মানসিকতায় সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কাছে রসিক বারেবারে লাঞ্ছিত। নতুন দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে ওঠা সরল অথচ স্পষ্ট, ঋজু, দূরন্ত স্বভাব নিয়ে সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না রসিক। অনন্ত কুমারের কৃত্রিম ব্যবহার, স্বার্থপরতা, কূট পরিকল্পনা শিক্ষক ও সহপাঠীদের সামনে রসিককে অপমানের মধ্যে ফেললে বয়সোচিত প্রতিবাদী স্বভাব-ধর্মে ক্ষিপ্ত মানসিকতা প্রকাশ করে ফেলে রসিক এবং চূড়ান্ত লাঞ্ছনার মুখোমুখি হয়। রোমাঞ্চকর কাজে উৎসাহী রসিকের উত্তেজনা তাকে স্কুলে যেমন ডানপিটে করে তেমনি প্রেমের ক্ষেত্রেও তার এই স্বভাব ধর্মের প্রকাশ। অল্প বয়সে বিবাহের পর স্ত্রীর সঙ্গে মিলনে সামাজিক বাধা এলে পৃথ্বিরাজের ঐতিহাসিক ঘটনার অনুকরণ করে রসিক—কিশোরের নির্ভীক রোমাঞ্চজনক কাজে উৎসাহ তার মধ্যে প্রতিফলিত।

‘উপবাসী’ গল্পে রূপচাঁদের মধ্যেও দেখা যায় নিজের প্রেমিকের ওপর অধিকার বজায় রাখার জন্য দূরন্ত-স্বভাব কিশোরের পরিকল্পনা। রসিকের মতো উত্তেজনার উগ্রতা নেই তার, কিছুটা ধীর স্থির পথে তার কার্যসিদ্ধির ধরন। প্রেমিকার বিবাহ বন্ধ করতে বরযাত্রী আসার সময় তার গাধার ডাকের পরিকল্পনা ও ঘোড়ার গাড়ি উল্টে দিয়ে বরযাত্রীদের আহত করার চেষ্টায় দুরন্ত অথচ রসিকের থেকে পৃথক এক কিশোর চরিত্র ফুটে উঠেছে। বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে তিন থেকে পাঁচ বছর বয়সী শিশু চরিত্রের মধ্যে বীরত্ব প্রকাশের যে ইচ্ছে তা কল্পনাসর্বস্ব এবং তা নিরাপত্তা মেনে দেখা দেয়। কিন্তু কৈশোরের শারীরিক শক্তি বৃদ্ধি ও মানসিক পরিণতি কিশোরকে অগ্রসর করে কল্পনার বাস্তব রূপায়ণে, পৌরুষের দীপ্ত প্রতিষ্ঠায়।

কিশোরের আত্মমর্যাদা বজায় রাখার চেষ্টায় প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার স্বাবলম্বী চিন্তায় এগিয়ে যায় ‘শনিবারের উপদেশ’ গল্পে কয়েকটি কিশোর চরিত্র। শিক্ষকদের কাছে বনমালী বা বুনোর অন্যদের থেকে শ্রেষ্ঠত্ব দেখানোর প্রবণতা, প্রয়োজনে অন্যকে হেনস্থা করে নিজের সুনাম রাখার চেষ্টা যুগল, শৈলেন প্রভৃতিকে উত্ত্যক্ত করে। তাদের বিশেষ কৌতুকময় বুদ্ধিতে হরকালীকে স্বপ্ন দিতে গিয়ে শিবের সাজে বুনো ঢুকে পরে হেডমাস্টার ও সুপারিটেন্ডেন্টের ঘরে এবং অল্প সময়েই শিক্ষক মহলে বিরাগভাজন হয়। কৈশোরের চঞ্চল ডানপিটে স্বভাব ধর্মের মধ্যে যে সুস্থ প্রাণশক্তি থাকে তাকে প্রকাশ করে যুগল ও শৈলেনের চরিত্র। এই প্রাণধর্মেই বিদ্যালাভের নীরস গতানুগতিক পথ তাদের ভালো লাগে না, শনিবারের শেষের ক্লাসে নীতি শিক্ষায় অনীহার মধ্য দিয়ে কিশোরের প্রকৃত স্বরূপ বাস্তবতার সঙ্গে বিশ্লেষিত।

‘ঘোষের অভিমন্যু’ গল্পেও লেখক এনেছেন এরকম দুরন্ত চরিত্রের কিশোর ঘোষকে। তার ডানপিটে স্বভাব অনেকটা ‘পৃথ্বিরাজ’-এর রসিকের মতো। তবে রসিকের কল্পনাপ্রবণ অনুভূতি বা আবেগ থেকে তার চাঞ্চল্য আসে না। সকলকে ছাপিয়ে বাহাদুরি দেখানোর প্রবণতা ঘোষের মধ্যে বেশী। এই মানসিকতা থেকেই ‘অভিমন্যু বধ’ এর দৃশ্যে মঞ্চে

ছুঁচোবাজী ছেড়ে পৌরাণিক কাহিনীকে যখন সে পাল্টে দেয় তখন সরস, হাস্যময় আবেদন গল্পে এসে যায় চরিত্রের এই বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য। ঘোষের মধ্যে কূট পরিকল্পনা কাজ করে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব বজায় রাখতে। এই চরিত্র-বৈশিষ্ট্যের মধ্যদিয়ে বস্তুতঃ কিশোরের স্বাবলম্বী আত্মপ্রতিষ্ঠা, নির্ভীক স্বভাব-ধর্ম লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন।

আবার কল্পনাপ্রবণ সুকুমার মন নিয়ে কিশোরের চাঞ্চল্য দেখা যায় 'ইতিহাস' (তালবেতাল, আষাঢ় ১৩৬৩) গল্পে। ইতিহাসের এক বিশেষ অধ্যায়—রাজা জেমস্ জয়েসের গান পাউডার প্লটে বিশেষ মনোযোগী হয় গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র সন্তোষ। শিক্ষক নিজের পেশার আদর্শের দিক থেকে তাকে বিচার করেন, যেকারণে সন্তোষের মনোযোগ তার একাগ্রতার কারণ বলে ধরেন তিনি। অত্যধিক পণে দিদির বিবাহের সময় সন্তোষের বিমর্ষতা, বিয়ের দিন তার উচ্ছ্বাস আবার মাঝে মাঝে দুশ্চিন্তা থেকে একই ধারণা পোষণ করেন শিক্ষক। শিশুমন সাংসারিক চিন্তায় ক্লিষ্ট ভেবে বেদনা বোধ করেন তিনি। কিন্তু বিয়ের দিন বরাসনের পাশে বরের পিতা ও মামার উচ্চাসন থেকে বারুদ সমেত পটকা বেরিয়ে এলে এই কিশোরের মন কোন সূত্র ধরে কি বিষয় লালন করে চলেছিল তা স্পষ্ট হয় শিক্ষকের কাছে। সন্তোষের বিশেষ বিষয়ে আগ্রহের তাৎপর্য পরিষ্কার হয় তাঁর। সাংসারিক সমস্যা স্পর্শকাতর অনুভূতি জাগায় কিশোরের সুকুমার মনে। সেই কারণেই শিক্ষকের শিক্ষকসুলভ আদর্শ চিন্তার বিপরীতে থাকে সন্তোষের প্রতিবাদী আত্মপ্রকাশের ধরন। ইতিহাসের উত্তেজক ঘটনা প্ররোচিত করে তাকে বরপক্ষকে শাস্তিদানের বিশেষ পরিকল্পনা গঠনে। বীরত্বের কাজ যে পুরুষের বিশেষ ব্যক্তিত্বের পরিচায়ক এ ধারণায় মোহগ্রস্ত থাকে শৈশব ও কৈশোরের সন্ধিক্ষণের কিশোর চরিত্র। পূর্ববর্তীবয়সের তুলনায় এ বয়সে স্বাবলম্বীভাবে প্রকাশের বুদ্ধিতে, শক্তিতে আরও ভরপুর হয় চরিত্র। কেন্দ্রীয় চরিত্রের মনস্তত্ত্ব ও আচরণের যথার্থ স্বভাবধর্মটি সরসতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন লেখক।

'নভেলিষ্ট' (দুষ্টু-লক্ষ্মীদের গল্প, বৈশাখ ১৩৬৪) গল্পেও উঠে এসেছে কিশোরের জগৎ। কৈশোরের স্বপ্ন, কল্পনা নিয়ে উৎসাহের সঙ্গে কাজে হাত দেওয়া, নিজের ক্ষমতা সচেতনতা অপেক্ষা ইচ্ছে হওয়া মাত্রই উত্তেজনাবোধ, ফলে তাতেই অগ্রসর হওয়ার অদম্য ঝোঁক কিন্তু পরে অক্ষমতাজনিত সমস্যা ও বাস্তব সঙ্কটের মোকাবিলা না করতে পারা গল্পের প্লটের বিন্যাসে ফুটে উঠেছে। বন্ধু ফকরের উত্তেজনায় কেন্দ্রীয় চরিত্র শৈলেনের গল্পলেখক হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার ঝোঁক বেড়ে যায় ক্রমশঃ, তার অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিশেষ ধরন বাস্তব বুদ্ধি-বিবেচনার মাত্রাকে ছাপিয়ে যায়। শরৎচন্দ্রের নভেল থেকে দ্রুত নভেল লেখার কলাকৌশল শিখে ফেলার আগ্রহে অবশেষে নভেলেই মনোনিবেশ করা, গল্পের আকর্ষণে মগ্ন হয়ে উদ্দেশ্য ভুলে যাওয়া ও অভিভাবকের হাতে গুরুতর লাঞ্ছনা ভোগকে লেখক সরস রচনা শৈলীতে পরিবেশন করেছেন। স্বাবলম্বী আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রবণতায় চরিত্রের এই বিশেষ উদ্যম গল্পে প্রকাশিত।

বাগদীর ছেলের অফুরন্ত প্রাণশক্তি, ডানপিটে স্বভাব 'বাংলা' (হাতেখড়ি, আশ্বিন, ১৩৫৪) ছোটগল্পটিকে মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে। আলসে বিহীন ছাতে ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে কালু বাগদীর ছেলে ফ্যালারাম পড়েছে বুড়ি দিদিমার ঘাড়ে। দিদিমাকে মরণাপন্ন ভেবে সে এসেছে ডাক্তারবাবুর কাছে। ঘটনার মূল বিষয়ে পৌঁছতে লেখক আশ্রয় নিয়েছেন নাটকীয় রসের। বুড়ি দিদিমার ঘাড়ে উঁচু ছাত থেকে পড়ে নিজেই ডাক্তার ডাকতে আসা ফ্যালারামকে দেখে তার কষ্টসহিষ্ণুতার সক্ষমতায় ডাক্তারবাবু বিস্মিত।

গল্পস্রোত যেভাবে এগিয়েছে তাতে প্রথমে প্রকাশিতই হয়নি যে দশবছরের এই ছেলেটিই ছাত থেকে পড়ে আহত হয়েছে। পথে গোসাপ তাড়িয়ে নির্বিঘ্নে সে ডাক্তারবাবুকে নিয়ে আসতে সচেষ্ট হয়েছে। বিভূতিভূষণের এই গল্পে শিশুটির মধ্যে একদিকে যেমন প্রকাশিত হয়েছে অদম্য প্রাণশক্তি তেমনি অন্যদিকে ধরা পড়েছে নিজেকে উপেক্ষা করার সহজ সাবলীলতা। হাস্যরসোজ্জ্বল গল্পটি পরিণামেও সরস হয়েছে যখন দেখি ফ্যালারামের দিদিমাও অবলীলাক্রমে বেঁচে আছে ও ফ্যালারামকে নাগালের মধ্যে পাওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে, এই পরিস্থিতির উল্টোদিকে ফ্যালারাম গেছে তার মৃত দিদিমার জন্য বাঁশের চালি জোগাড় করতে। এ হেন অবস্থায় ডাক্তারবাবুর ডাক্তারি পরীক্ষা-নিরীক্ষার গুরুত্ব কাউকে বোঝানো বৃথা চেষ্টা। বাগদী পরিবারের জীবনীশক্তিই তাদের বাঁচিয়ে রাখতে যথেষ্ট—এই অনুভূতি ডাক্তারবাবুর হয়েছে।

সরস উপস্থাপনার মধ্য দিয়ে একটি অন্যমাত্রার শিশুচরিত্র এই গল্পে বৈচিত্র্যের স্বাদ এনেছে।

'অসিত' (মানসমিছিল, মাঘ ১৩৭৩) গল্পটিতে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত। বড়লোক ব্যবসায়ীর তেরো-চোদ্দো বছরের পুত্র অসিতের গৃহশিক্ষক হলেন লেখক। অন্য সবদিকে সুব্যবস্থা থাকলেও বেতন সময়মত পাওয়া নিয়ে লেখকের উদ্বেগ ও তার কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে শিশুচরিত্রের ব্যবসায়ী বুদ্ধির প্রবণতা লেখককে চমকিত করেছে। গৃহকর্তার কাছে অনুসন্ধান করে লেখক জেনেছেন ছাত্রের হাতে বেতন সময়মতই পৌঁছে যায় কিন্তু তা সত্ত্বেও প্রতিমাসে সময়মত বেতন হাতে পান না লেখক। ছাত্র অসিতকে নানাভাবে প্রশ্ন করায় উত্তর জানা যায়—দারোয়ান হীরা সিংকে মাঝখানে রেখে সুদের কারবার করে শিশুচরিত্র অসিত। পানওয়ালা, বিড়িওয়ালা, রিক্সাচালক প্রভৃতির কাছে লেনদেনের কারবার করে অসিত—টাকা পিছু এক পয়সা করে সে সুদ আদায় করে। লেখক বেতনের প্রসঙ্গ তুলে দেরী হওয়ার কারণ জানতে চাইলে অসিত লজ্জিত মুখে পাঁচ টাকা বারো আনা লেখকের শেয়ার এনে হাজির করে। আরো বিস্তৃত ব্যাখ্যা করে সে বলে মুনাফার তিনভাগের একভাগ হীরা সিং-এর, একভাগ অসিতের ও একভাগ গৃহশিক্ষকের। লেখক যে ছেলেকে ভুলোমনের মনে করে পিতার ব্যবসা দেখভাল সম্বন্ধে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে এই প্রকারের দুরভিসন্ধি ও ব্যবসায়ীর সুকৌশল পদ্ধতি দেখে বিমূঢ় ও চমকিত হলেন। সরস কৌতুকপূর্ণ গল্প বিভূতিভূষণের প্রসন্ন জীবনদৃষ্টির কারণে যে রসসার্থক হয় তা 'অসিত' গল্পটি আরেকবার পাঠকের কাছে প্রমাণিত করে।

৪

নয় থেকে চৌদ্দ বছরের দৈহিকশক্তি ও প্রাণপ্রাচুর্যে সতেজ, দুরন্ত কিশোর চরিত্রকে নিজের সামাজিক পরিবেশ থেকে যেমন লক্ষ্য করেছেন লেখক তেমনি এই সমাজ ও পরিবেশ সচেতনতা থেকেই বাল্যবিবাহিতা কয়েকটি কিশোরীচরিত্র সৃষ্টি করেছেন বিভূতিভূষণ। নয় এর ঊর্ধ্বে কিশোরেরা যেখানে স্বাধীন ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠায় তৎপর, অভিভাবকের তত্ত্বাবধান থেকে দূরে সরে নানা ভুলভ্রান্তির পথ ধরে পৌরুষের উপলব্ধিতে যে বয়সে তারা তৃপ্ত সেই সময়ে শ্বশুরালয়ে আদরণীয়া হয়ে ওঠার দায়িত্ব পালনে সচেতন হতে দেখা যায় সমবয়সী এই কিশোরীদের। পুরুষ ও নারীর ভূমিকার পার্থক্য সুস্পষ্ট সমবয়সী কিশোর ও কিশোরীর আচরণে। নয় এর নিম্নবয়সী বালক-বালিকার চাঞ্চল্য সমপর্যায়ে কখনও থাকলেও, নয়-এর ঊর্ধ্বে ছেলেরা যে মেয়েদের অতিক্রম করে একথা বিজ্ঞান-স্বীকৃত। বিভূতিভূষণও তাঁর বাস্তব জীবনঅভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বিজ্ঞানসমর্থিত এই অভিমতকেই প্রতিষ্ঠা করেছেন। শ্বশুরালয়ে নতুন পরিবেশ, নতুন জীবনের সঙ্গে মানিয়ে চলার আড়ালে এ সব কিশোরীমনে কখনও দেখা দেয় পূর্বজীবনের জন্য আকুলতা, পিতৃগৃহের অতীতের স্মৃতি তাদের বয়ঃসন্ধিক্ষণের মুহূর্তকে ব্যাকুল করে। অল্পবয়সের শিশুসুলভ চাঞ্চল্যে আর স্মৃতির বেদনায় তাদের একাত্ম হতে দেখেছেন লেখক 'জালিয়াত' (রাণুর তৃতীয়ভাগ, আষাঢ় ১৩৪৭) ও 'শারদীয়া' (শারদীয়া, মহালয়া ১৩৪৮) গল্পে।

'জালিয়াত' গল্পে ন'বছরের ঊর্ধ্ব বয়সী চপলা তার পারিবারিক ও সামাজিক পরিবেশের শিক্ষাকে অনুসরণ করে সেবাধর্মের মধ্য দিয়ে বধূর কর্তব্য সম্পাদন করে। শ্বশুরের স্নেহে পিতৃগৃহ ছেড়ে আসা নববধূর প্রাণে লাবণ্যের যে সঞ্চার তার দ্বারাও চপলা এই সেবায় অনুপ্রাণিত। কিন্তু এই কিশোরী নববধূর কর্তব্য পালনে কোন পরিণতমনা বধূর শান্ত, নম্র অভিব্যক্তি ফুটে ওঠে না, চঞ্চলতাই তার আপন প্রকৃতির কথা। এই প্রকৃতিকথা গোপন রাখতে পারে না চপলা। 'পল্লীর দুলালী' সে, 'ওর বাড়ি ছিল সদর-রাস্তা, বন-বাদাড় দীঘির ধার'—এই চপলা 'আজ কলিকাতার বধূ'। পল্লীগ্রামের মুক্ত প্রকৃতিতে উচ্ছ্বাসময় জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত চপলার চঞ্চলতার প্রকাশেই ফুটে উঠত প্রাণের দীপ্তি। শহরের মাপা ঘর, মাপা দালান, যাতায়াতের নির্দিষ্ট সীমানায় সে বন্দী মনে করে নিজেকে। আপন প্রকৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন এই নববধূ কৃত্রিম জীবনযাপনে ক্রমে আনন্দহারা হয়। পল্লীর অতীত জীবন '...সর্বদাই ওকে যেন কান্নার সুরে ডাকিতে থাকে।' এই মনস্তত্ত্বে চপলা যখন কলকাতার বিস্ময় জাগানো দ্রষ্টব্যস্থানে বেড়াতে নিস্পৃহ থাকে, স্বামী ও শ্বশুরের ভালবাসাপ্রীতির মধ্যেও পরিতৃপ্তি পায় না, সুখস্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যেও বেলপুকুরের জন্য অস্থিরতা প্রকাশ করে তখন স্বামী বা শ্বশুরের কাছে স্পষ্ট হয় না বধূর

আচরণ। মুক্ত প্রকৃতিতে আনন্দিত পদক্ষেপ ফেলার দীর্ঘ আকাঙ্ক্ষা লালনের পর হঠাৎ কখনও সুযোগ এলে চপলার দীর্ঘকালের বদ্ধ মন স্নিগ্ধ উদার প্রকৃতির শেষ সৌন্দর্য্যকণাটুকু আস্বাদন করে যেন তৃপ্ত হতে চায়। স্বামী সঙ্গে থাকলেও চপলার কাছে এই মুক্তি অন্য এক তাৎপর্যে উদ্ভাসিত। 'সিড়ি বাহিয়া সুবিস্তীর্ণ চত্বর, যে দিকটা ইচ্ছা হনহন করিয়া অনেকটা চলিয়া যায়, পায় পায় কতিদিনের শৃঙ্খল যেন খসিয়া পড়িতেছে। মন্দিরে উঠে, সুগঠিত সৌম্য মূর্তির সামনে মাথা নোয়াইয়া থাকে অনেকক্ষণ ; কিছুই প্রার্থনা করে না, পড়িয়া থাকার মুক্ত অবসর, তাই পড়িয়া থাকে।'[৮]

মুক্ত পল্লীজীবনে ফিরে যেতে আকুল এক কিশোরী নববধূর মনস্তত্ত্বের এই বিশ্লেষণ সংলাপ ও কাহিনীমুখ্য আবেদন ছাপিয়ে অনুভব গভীরতা ছোটগল্পে এনে দিয়েছে। নানা প্রতিকূলতা কাটিয়ে অবশেষে বাবার চিঠি নকল করে বেলপুকুরে যাওয়ার ব্যবস্থা নিজেই করে চপলা। তার চিঠির অক্ষর নকল করার অপরাধ সম্পর্কে উদ্বেগবোধ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে এক অল্পবয়সী বধূর শিশুপ্রকৃতি মরমী দ্রষ্টার ভূমিকা নিয়ে চিত্রিত করেছেন লেখক।

কিশোরী-বধূর বেদনাবোধ উপস্থাপিত 'শারদীয়া' গল্পেও। বিত্তবান সনাতন রায় তার পুত্রবধূ নির্বাচন করেন নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে। অর্থের কাছে ভালবাসা পরাভূত হবার নয়—দরিদ্র শিক্ষকের এই ব্যক্তিত্বপূর্ণ আদর্শবাদী মত খন্ডন করতে চান অর্থে প্রতাপশালী সনাতন রায়। বিত্তবান সনাতন রায়ের চাতুর্যের কাছে, বিলাসের পরিবেশে, নিজের বিশেষ পদমর্যাদা খুঁজে পায় নববধূ। অতীতের দরিদ্রজীবন বাস্তবিকই ভুলে থাকে সে। নতুন জীবনঅভিজ্ঞতার মোহে এই সময়ে শিশুমন অভিভূত। পুজোর উৎসব দ্বিগুণ করে দিয়ে সনাতন রায় যখন এই বধূমনকে পিতৃগৃহের স্মৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করতে তৎপর তখনই পুজোর দিনে শরতের শিউলিভরা চাতাল, পদ্ম-ভরা পুকুর নববধূকে উতলা করে। ঐশ্বর্যের প্রাসাদের বাইরে বহু পরিচিত অথচ ভুলে থাকা প্রকৃতির কাছে এসে দাঁড়ালে পুজোর দিনে দরিদ্র পিতার ক্ষুদ্র অথচ প্রাণপ্রাচুর্যে ভরা আয়োজনের স্মৃতি বিচলিত করে তাকে। মনে পড়ে,—'আর বৎসরও ঠিক এই আজকের দিনের এই সময়টা ফুল লইয়া নিয়াছিল ... যেন দেখা যায় ... শীতলার মার উঠানের উপর দিয়া যাইতেছে দুজনে খুব জোরে ... খোকা তাহাকে হাঁটায় হারাইয়া দিবার জন্যে একেবারে ঝুঁকিয়া গিয়াছে সামনের দিকে ... রেষারেষির ঝোঁকে দুজনেই এক এক বার হাসিয়া উঠিতেছে ...।'[৯]

স্মৃতির এই উদঘাটনেই বিলাসের মুগ্ধতা কেটে যায়, মনোভারে বিমর্ষ হয় নববধূ—পুজোর দিনে পিতৃগৃহে যাওয়ার জন্য কিশোরীমনে আকুলতা জাগে। বয়ঃসন্ধিক্ষণের অনুভব এক বিশেষ পরিবেশে ফুটিয়ে তুলেছেন লেখক।

৫

বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোরী চরিত্রের পছন্দের পুরুষের প্রতি অভিব্যক্ত মনস্তত্ত্ব 'জামাইষষ্ঠী' (লাজবতী, আশ্বিন ১৮৮২ শকাব্দ) ছোটগল্পটির কেন্দ্রীয় বিষয়। জয়হরির পুকুরে নীরদ লুকিয়ে মাছ ধরতে বসলে তাকে নানাভাবে উত্ত্যক্ত করে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুচরিত্র সতী। মাছ ধরতে না পারার যাবতীয় চেষ্টার পর ছিপে ধরা মাছ দখল করতে চায় সে। সতীর ইচ্ছেতে নীরদ বাধা দিলে জয়হরিকে খবর দেওয়ার ভয় দেখায় সতী। এই পরিস্থিতিতে জয়হরি উপস্থিত হলে এবং নীরদ ধরা পড়ে তিরস্কৃত হবার উপক্রম হলে সতীরই উপস্থিত বুদ্ধি ও কথার ছলচাতুরিতে রক্ষা পায় নীরদ। ভালোলাগার জনকে অকারণ উত্ত্যক্ত করা আবার বিপদের মুখ থেকে তাকে রক্ষা করা—নারীর এই জটিল মনস্তত্ত্ব বোধগম্য হয় না নীরদের। বয়ঃসন্ধিক্ষণের নারীচরিত্রের মধ্যে প্রাপ্তবয়স্কা নারীর প্রেমের ছলচাতুরির জটিল মনস্তত্ত্ব নিপুণ দক্ষতায় ফুটে উঠেছে 'জামাইষষ্ঠী' ছোটগল্পে।

'দুঃসাহসী' (কন্যা সুশ্রী এবং স্বাস্থ্যবতী, মার্চ ১৯৬২) গল্পে বয়ঃসন্ধিক্ষণের চরিত্র অঙ্কন করেছেন বিভূতিভূষণ। এই গল্পের শিশুচরিত্র দীপার মধ্যে লেখক অন্বেষণ করেছেন রোমাঞ্চপ্রিয় বয়ঃধর্মকে। নিরাপত্তার বেষ্টনীর মধ্যে থেকে দুঃসাহসিক কাজের জন্য অস্থিরতা অনুভব করে প্রায় চোদ্দবছরের কাছাকাছি শিশুচরিত্র। বয়সোচিত এই প্রবণতা প্রচলিত নীতি-নিয়মকে ভাঙ্গতে তৎপর। বিদ্যালয়ে যেমন এই প্রবণতা দেখায় শিশুচরিত্র তেমনি জীবনসঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রেও

এই মনোধর্মের পরিচয় দিতে উৎসুক, চঞ্চল হয় শিশুচরিত্রটি। পার্শ্বচরিত্র দীপার কাছে নিজের দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিতে বি.এ. ক্লাসে পড়া কেন্দ্রীয় চরিত্র তাই বিনা টিকিটের যাত্রী হয়। পরবর্তী সময়ে ধরা পড়ে সে স্বীকার করে এই কাজের মধ্য দিয়ে সে দীপার কাছে 'দুঃসাহসী' অভিধায় অভিহিত হতে সচেষ্ট হয়েছিল। যুবকটির ধরা পড়ার পরবর্তী ঘটনাগুলিতে ধরা পড়ে যুবকটি সম্পর্কে দীপার কৌতূহল। তার দৃষ্টিতে আকুলতার ছাপও নজর এড়ায় না লেখকের। সরস আখ্যানরসের মধ্য দিয়ে বয়ঃসন্ধিক্ষণের মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা গল্পটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

৬

পার্শ্বচরিত্রের কিশোর-কিশোরীরাও বিভূতিভূষণের বাস্তব-সচেতন দৃষ্টিকোণ থেকে রূপায়িত। পার্শ্বচরিত্রের কিশোর-কিশোরীদের নিয়ে বড় বৃত্ত এক্ষেত্রে তৈরী করেছেন লেখক। তার গল্পে এসব চবিত্র কেবল উল্লেখের পর্যায়ে থাকে না, তারা মূল গল্পের সঙ্গে জড়িত হয় তাৎপর্যের সঙ্গে। কেউ কেউ বা তাদের নিজস্ব গঠনে, স্বভাবধর্মে চোট গল্পে এনে দিতে পেরেছে সরস আবেদন। বিভূতিভূষণের দরদী জীবন পর্যবেক্ষণের বৈশিষ্ট্যে সজীব প্রণধর্ম তাদের মধ্যে প্রকাশিত।

'গোলাপী রেশম' (বরষায়, কার্ত্তিক ১৩৪৭) গল্পে কেন্দ্রীয় শিশু চরিত্র শৈলেন ও গোবরা। ন'বছর বয়সী ছেলে শিশুর প্রেম সম্পর্কিত বিকাশ, পৌরুষের প্রকাশ, পুরুষোচিত অধিকারবোধ ও অভিমান, ঈর্ষা, মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে নিয়ে এসেছেন লেখক। চারুর নানা পরিকল্পিত ছল, কৌতুকপূর্ণ চাপল্য, তার ভক্ত হয়ে থাকার মোহ ও তার থেকেই গোবরা ও শৈলেনের দ্বন্দ্ব যেভাবে লেখক দেখিয়েছেন তাতে যেন শিশুর মধ্যেই বীজ আকারে লুকিয়ে থাকে ভবিষ্যতের পুরুষ।

অবশ্য এই প্রেম সম্পর্কিত ধারণার ক্ষেত্রে ছেলেদের তুলনায় মেয়েদের পরিণতিতে বারবার জোর দিয়েছেন লেখক। 'ভালবাসা' (বসন্তের, শ্রাবণ ১৩৪৮) গল্পে এ দৃষ্টিগুলি আরও সুস্পষ্ট। পরিণতমনা কুন্তলার পাশে বেশীবয়সী অথচ সরল শৈলেন বারে বারে অপদস্থ। পরিণত বয়সের স্মৃতি থেকে শৈলেন বিবৃত করেছে শৈশব অভিজ্ঞতা। শৈশব স্মৃতির সঙ্কটময় মুহূর্তের অভিজ্ঞতা বর্তমানেও তাকে নারীর প্রেমের উল্লেখে ব্যঙ্গময় করে। বস্তুতঃ সাত বছরের কুন্তলার ভালবাসার দাবীতে ন'বছরের শৈলেনকে নানাভাবে লাঞ্ছিত করার চেষ্টা এবং প্রকৃত চূড়ান্ত অপমানে ও শারীরিক নির্যাতনে বারে বারে শৈলেনের বিপর্যস্ত মুহূর্ত তার শৈশব মনে ভয় ও সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। তার প্রভাব প্রতিফলিত শৈলেনের এই পরিণত বয়সের ব্যাঙ্গাত্মক দৃষ্টিভঙ্গিতে।

৭

কৈশোর ধর্মের মধ্যে লেখক নিয়ে এসেছেন কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি গুণমুগ্ধ একদল পার্শ্বচরিত্রকে। নিজেদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতরের প্রতি এই চরিত্রগুলি এক মোহমুগ্ধ আকর্ষণ যেন বোধ করে, প্রভাবিত হয় তাদের মাধ্যমে। 'পৃথ্বিরাজ' (রাণুর প্রথম ভাগ, বৈশাখ ১৩৪৪) গল্পে থার্ড ক্লাসের ছাত্র বারো তেরো বছর বয়সী মাখন কিংবা 'উপবাসী' (বর্ষায়, কার্ত্তিক ১৩৪৭) গল্পের রূপচাঁদের ভক্ত চোদ্দ বচরের রহমতের মধ্যে এই প্রবণতা চিত্রিত। স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব অপেক্ষা কেন্দ্রীয় চরিত্রের প্রতি কৈশোরের উচ্ছ্বাস ও মুগ্ধতা এদের চালিত করে। এই ধরনের পার্শ্বচরিত্রের উপস্থিতির মধ্য দিয়ে লেখক কেন্দ্রীয় চরিত্রের একান্ত ব্যক্তিগত মানসিকতা প্রকাশ করেন, কেন্দ্রীয় চরিত্রের সম্পূর্ণ চরিত্র কাঠামো ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করে এ ধরনের পার্শ্বচরিত্র।

মিল থাকলেও 'পৃথ্বিরাজ' এর মাখনলাল আর 'উপবাসী' গল্পের রহমতের মধ্যে পার্থক্যও প্রচুর। মাখনলালের মত আন্তরিক অনুগত রহমত নয়, বিপদের সম্ভাবনা দেখলে নিজের সাবধানতা বিষয়ে সচেতন এবং স্বার্থপর সে। এখানে বরং তার সঙ্গে কিছুটা মিল এসেছে, 'পৃথ্বিরাজ'-এর অনন্তকুমার বা 'শনিবারের উপদেশ' এর বুনোর সঙ্গে। অবশ্য পূর্বোক্ত চরিত্র এই পরোক্ত চরিত্রদের মত চূড়ান্ত কুট বুদ্ধিতে বা ক্ষতিকারক চিন্তায় চালিত নয়। 'পৃত্বিরাজ' গল্পে অনন্তকুমার ও

'শনিবারের উপদেশ' গল্পের বুনোর মধ্যে শৈশব পার হওয়া কিশোরের সুকুমার সতেজ চিন্তাশক্তি মৃত। তাদের মধ্যে বয়সোচিত প্রাণলাবণ্য, মনের সুস্বাস্থ্য অনুপস্থিত। নিজেকে ভালো প্রমাণ করার তাগিদে সহপাঠী বন্ধুদের অপদস্থ করার কূট অভিসন্ধিতে তাদের কৈশোর মন ভারাক্রান্ত। এই পার্শ্ব চরিত্রের পাশে কেন্দ্রীয় চরিত্রকে তার স্বধর্মে প্রতিষ্ঠিত করতে লেখকের এই বিশেষ গোষ্ঠীর কিশোর চরিত্রের পরিকল্পনা।

কেন্দ্রীয় চরিত্রের গুণমুগ্ধ ভক্ত হিসেবে দেখা যায় 'নভেলিষ্ট' (দুষ্টু-লক্ষ্মীদের গল্প, বৈশাখ ১৩৬৪) গল্পের ফকরেকেও। তবে কেন্দ্রীয় চরিত্র তাকে চালনা করে না, বরং ফকরের প্রভাবে শৈলেন চালিত। শৈলেনের মধ্যে প্রতিভা নিশ্চিতভাবে খুঁজে পায় যেন ফকরে এবং কৈশোরের উত্তেজনা, পুলক, আবেগে তার সর্বস্ব চিন্তা শক্তির প্রয়োগ করে শৈলেনের উন্নতি কামনায়। ফকরের এই কার্যকলাপের মধ্য দিয়ে উঠে এসেছে আবেগতাড়িত লঘুচিত্ত এক কিশোর চরিত্র। এই পার্শ্বচরিত্রের প্রভাবেই কেন্দ্রীয় চরিত্রের ক্রমবিকাশ ও পরিণতি ত্বরান্বিত ও ছোটগল্পে হাস্যরসের আবহের নির্মাণ যথার্থ।

৮

এই দুরন্ত, উত্তেজনাসর্বস্ব পার্শ্বচরিত্রের পাশাপাশি শান্ত প্রকৃতির, সুকোমল স্পর্শকাতর অনুভূতিময় কিশোর চরিত্র দেখা যায় 'ঘোষের অভিমন্যু' গল্পে লেখকের মধ্যে। এই চরিত্রে কাজ করে নির্মমতা সহ্য করতে না পারার কোমল মন, 'অভিমন্যুবধ' পালাকে থামাতে যে কারণে চরিত্রের তীব্র ব্যাকুলতা। পার্শ্ব-চরিত্রের এই বিশেষ প্রবণতা থেকেই কেন্দ্রীয় চরিত্র ঘোষের যাবতীয় পরিকল্পনা, এবং মহাভারতের কাহিনীর বদল ঘটিয়ে যে পথে তার অসাধ্যসাধন গল্পের পরিণতি তাতে কৌতুকরসে পূর্ণ হয়ে ওঠে।

'কাব্যের মূলতত্ত্ব' (রাণুর প্রথম ভাগ, বৈশাখ ১৩৪৪) ও 'দিদিমণির বেড়াল' (আনন্দনট, ফাল্গুন ১৩৬৪) গল্প দুটিতে কেন্দ্রীয় ঘটনা ও কেন্দ্রীয় চরিত্রে ক্রমবিকাশের মধ্য দিয়ে ক্রমে প্রকাশিত হয় পার্শ্বচরিত্র। স্কুলের গতানুগতিক পাঠক্রম থেকে সৌভাগ্যক্রমে একদিন নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভাবনায় মেধাবী বা সাধারণ সব স্তরের কিশোরের উৎফুল্লতা, ছাত্রদের এক সাধারণ মানসিকতা 'কাব্যের মূলতত্ত্ব' গল্পে উপস্থিত করেছেন লেখক। কিশোরমনের খাঁটি সত্য উঠে এসেছে তাঁর রচনা নৈপুণ্যে। এধরনের কিশোরদলে আবার কোন কিশোরের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসে হয়ত হাতছাড়া হয় মুক্তিকামী ছাত্রদলের নিশ্চিত ছুটি। বাংলার শিক্ষকের অনুপস্থিতিতে ছুটির আসা গোপন করে দুঃখপ্রকাশ কিন্তু তার মাত্রাধিক্যে আকাঙ্ক্ষিত ছুটি নস্যাৎ করে অঙ্কের শিক্ষককে কাব্যের ক্লাশ নিতে রাজী করিয়েছেন প্রধান শিক্ষক। ছুটির বদলে ভীতিপ্রদ অঙ্কের মধ্য দিয়ে নবীনচন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধ' ব্যাখ্যায় কিশোর দলের চূড়ান্ত সঙ্কটকে হাসোজ্জ্বল রচনাশৈলীতে পরিবেশন করেছেন লেখক।

সরস গল্প 'শরৎবাবু' (মানস মিছিল, মাঘ ১৩৭৩)-তে শিশুচরিত্র সুবালা 'নাইন ক্লাসের' ছাত্রী। চোদ্দ বছরের সুবালা পরীক্ষার পড়ার মনোযোগী ছাত্রী হতে চেয়ে বেছে নিয়েছে ছাতের ঘর। দাদা অতীন স্ত্রী-শিক্ষার বিরোধী। বাড়ির বড়দের অনেকেই এই মতে বিশ্বাসী। তাই নিরিবিলিতে পড়ার জন্যে শিশুটির এই ব্যবস্থা। নভেল পড়ার ঘোরতর বিরোধী দাদা অতীন। বোনের পড়ার ব্যাপারে অত্যন্ত মনোযোগের কারণ অনুসন্ধান করতে সে তৎপর হলে পড়ার বইয়ের ফাঁকে বেড়িয়ে পড়ে শরৎবাবুর নভেল। সুবালা দোষী সাব্যস্ত হয়। বাড়ির মহিলারা সকলেই অতীনের কড়া শাসনকে মেনে চলে, কিন্তু শিশুটির এই স্পর্ধা প্রকাশে সকলেই বিস্মিত। কিন্তু ধীরে ধীরে প্রকাশিত ঘুনপোকা যে কিভবে নিঃশব্দে গভীরে ঢুকে পড়েছে—সুবালার কাছ থেকে সরিয়ে রাখা শরৎবাবুর নভেল আস্তে আস্তে বাড়ির অন্যান্য মহিলাদের ঘার থেকেও একসময় বেরিয়ে পড়ে। এমনকি, সুবালার ঠাকুমাকেও দেখা যায় ঠাকুরঘরের নিরালায় বসে শরৎবাবু পড়তে—সেটি 'চরিত্রহীন'। সুবালাকে কঠিন শাস্তি দেবে বলে মনে করেছিল অতীন। কিন্তু অন্দরমহলে এভাবে শরৎবাবুর আধিপত্য বিস্তারে তাকে হার মানতে হল। নিষিদ্ধ বিষয়ে ওপর কৌতূহল একা শিশুরই নয়, বড়দেরও বিচলিত হওয়ার কারণ হয়। কৌতুকরসের সিদ্ধ রূপকার বিভূতিভূষণ তাঁর কৌতুকময়তায় পাঠকমনকে ছুঁয়ে গেছেন।

বড়দের কাজের অনুকরণ শিশুচরিত্রে যেভাবে খুঁজে পান বিভূতিভূষণ তা বিশেষ ইঙ্গিতবহ। বড়দের অনুকরণ করলেও শিশুর কাজ শিশুর মনোজগৎ অনুসারীই হয়। 'ঘুষ' (শিশিরবসন্তৌ, ১৫ই আগস্ট ১৯৬৭) গল্পটিতে দাদা

মাণিলাললের অফিসের বড়কর্তার জন্মতিথিতে তাঁকে খুশি করতে কিছু ঘুষ দেবার প্রয়োজন হয় যাকে বাহারি নামে বলা হয় উপহার। নিজের প্রাণের থেকেও প্রিয় বাগানের গোলাপ, যা কিনা ফ্লাওয়ার শোর জন্যও কখনো দেয় নি মণিলালা তাই দিয়ে ফুলের তোড়া বাঁধে। এই ফুলের তোড়াটিই প্রয়োজন হয়ে পড়ে মণিলালের ছোটবোন এগারো কি বারো বছরের শিখার। কারণ একটাই—ঘুষ। পরীক্ষার আগে দিদিমণিকে খুশি করতে চায় সে। শিশুমনের জড়তা, সরলতার সঙ্গে শিক্ষিকার কাছে তার আকুলতা প্রকাশের বিষয়টি হয়ে ওঠে নিতান্তই সরস হাস্যসমুজ্জ্বল। আর শিশুচরিত্রটিকে মাঝখানে সেতু করে নির্মিত হয় প্রেমকাব্য—মণিলাল ও রেণুদিদিমণির মধ্যে প্রণয়ের সূত্রপাত হয়। রোজ শিখার হাতে ফুলের স্তবক পাঠায় মণিলাল। শিশুর সরলতাকে সামনে রেখে নিজেদের প্রণয়কে গোপন মাধুর্যে ভরায় নায়ক-নায়িকা।

প্রেমমনস্তত্ত্বের কৌতুকরসে পুষ্ট 'যুগলমার্জার' (শিশিরবসন্তৌ, ১৫ আগস্ট ১৯৬৭) ছোটগল্পটিতে গল্পরস দানা বেঁধে ওঠে দুটি পার্শ্বচরিত্রের শিশুর মাধ্যমে। শিশুচরিত্র দুটি ধারী ও অমলা। ধীরা ও অমলার বন্ধুত্বের সূচনা হয় কেটি পারসিয়ান ক্যাট দিয়ে। ধীরার কাছ থেকে এই বিড়ালটি উপহার পায় অমলা। কিন্তু বায়োলজিতে রিসার্চ করা ছাত্র অমলার দাদা সমীরের কাছে এই জীবটি নিতান্ত অপছন্দের, কেননা সেটি ডিপথেরিয়া রোগের উৎসস্বরূপ। তাই সমীরের আদেশ—বিড়ালটি ফেরত দিতে হবে। গল্পরস সহাস্য কৌতুকময়তা লাভ করেযখন হটাৎই সমীরের সিদ্ধান্ত বদল হয়ে বিড়ালটিকে খুব প্রয়োজন হয়। প্রেমমনস্তত্ত্বের সুনিপুণ রূপকার বিভূতিভূষণের হাতে ছোটগল্পটি অন্যদিকে মোড় ফেরে যখন সমীরের প্রণয়িনী মালাও একটি বিড়াল পোষে ও অমলার বিড়ালের কাছে নিজের বিড়ালটির বিয়ে দিতে চায়। প্রণয়িনীর মনোবাসনা উপেক্ষা করার নয়, তাই সমীর কড়া শাসনের বদলে আদর করে ডেকে আনে অমলাকে ও বিড়ালটির সমাদর বাড়ে। পার্শ্বচরিত্ররূপে দুটি শিশুচরিত্রের উপস্থিতিতে বড়দের প্রচ্ছন্ন মনোবাসনা আড়ালে থাকে, একমাত্র পাঠক গল্পশেষে কৌতুকের আমেজ খুঁজে পায়। শিশুচরিত্র দুটির আবশ্যকতা এখানেই।

বিভূতিভূষণের ছোটগল্পে বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুচরিত্ররা অনেকক্ষেত্রে পার্শ্বচরিত্রের ভূমিকা নিয়ে ছোটগল্পে সরসতার মাত্রা বাড়িয়ে তোলে। 'বর্ষায় বিরহিণী' (শিশিরবসন্তৌ, ১৫ আগস্ট ১৯৬৭) গল্পটিতে বর্ষায় বিরহিণীর রূপ উপলব্ধি করতে উৎসুক লোহার কারখানার মালিক। নিতান্তই বাস্তববাদী চরিত্র হল গোপীনাথ। এই সহাস্য পরিবেশকে ত্বরান্বিত করেছে নয় পার হওয়া চিন্ময়ী। তার কাছে বিরহিণী শব্দের ব্যাখ্যা শুনে ও বধুকে বর্ষায় তার স্বামীর অবর্তমানে নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে বয়স্ক গোপীনাথের মনেও নিজের স্ত্রীর বিরহিণী-রূপ দেখার ইচ্ছে জাগে। চিন্ময়ীর পদ্যের খাতা ও বিরহিণী শব্দের অর্থ কোলাব্যাঙ্গের তাৎপর্য খুঁজতে গিয়ে উদঘাটিত হয় বর্ষায় বিরহিণীর রূপ। গোপীনাথের মানসিক পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে সহাস্য জীবনরস সমস্ত গল্পটিকে উপভোগ্য করে তুলেছে।

শিশু-জগৎ আবিষ্কারে উৎসুক থাকেন বিভূতিভূষণ, আন্তরিক মনে কামনা করেন তাদের সঙ্গ, তাদের আকাশতলে দাঁড়ালে 'আলোয় আলোয়' মুক্তির বাণী প্রতিধ্বনি তোলে তাঁর সংবেদনশীল লেখকসত্তায়। 'মিত্র ও ঘোষ' প্রকাশিত তাঁর রচনাবলীর প্রথমখন্ডে 'আমার সাহিত্য জীবন'-এ শিশু-সঙ্গ উপভোগের প্রসঙ্গ তুলেছেন লেখক। বিভিন্ন জায়গায় একই প্রসঙ্গের উত্থাপন শিশুর প্রতি বিভূতিভূষণের মমত্ব প্রকাশিত, শিশুসঙ্গ উপভোগে এক উৎফুল্ল ব্যক্তিচরিত্র তাঁর মধ্যে দেখা যায়। এই শিশু অথবা কিশোর-কিশোরী যখন তাঁর ছোটগল্পের চরিত্র হয়ে ওঠে তখন ব্যক্তি বিভূতিভূষণের নিবিড় সহানুভূতি ও মমত্ব তারাও পেয়ে যায়।

শিশুচরিত্র প্রধান এই ছোটগল্পগুলির মধ্যে বিভূতিভূষণের ব্যক্তি জীবনের ছায়াপাত এসেছে অনেক গল্পে। মধ্যবিত্ত বাঙালী যৌথপরিবারের জীবনযাত্রা তাঁর শিশুচরিত্র-প্রধান বয়ঃসন্ধিক্ষণের ছোটগল্পের পটভূমি। নিজের ছেলেবেলার স্মৃতি এসে পড়েছে তাঁর অনেক গল্পের প্লট-নির্বাচনে। নিজের ছেলেবেলা প্রসঙ্গে তিনি জানিয়েছেন—'বাবা চলে যাওয়ার পর থেকেই আমিও বেরিয়ে পড়বার ফন্দি-ফিকির আঁটতে থাকতাম। খুব যে শক্ত ব্যাপার ছিল এমনও নয়। এই সময় বাড়িটা প্রায় নিশুতিই থাকত।'[১০]

'বর্ষায়' গল্পে নয়নতারার প্রতি শৈলেনের যে মুগ্ধতা তাও লেখকের ব্যক্তি-জীবনের 'এ্যাডোলেসেন্ট লাভ'-এর

স্মৃতি, 'গোলাপী রেশম' গল্পেও লেখকের শৈশব স্মৃতি ছাপ ফেলে যায়। শিশু-সঙ্গ প্রিয় বিভূতিভূষণ তাঁর শিশু-কিশোর-কিশোরী চরিত্র রূপায়ণ বাস্তবিকই এনে দিয়েছেন বিচিত্র পরিবেশের প্রেক্ষাপট।

১৩২২ সালে বিভূতিভূষণের প্রথম পুরস্কৃত গল্প 'অবিচার' 'প্রবাসী'-তে পত্রস্থ হয়। ১৩৪৪-এর বৈশাখ মাসে তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ 'রাণুর প্রথম ভাগ' রঞ্জন পাবলিশিং হাউস থেকে প্রকাশিত হয়। যে সময়ে বিভূতিভূষণের সাহিত্যযাত্রার সূচনা 'কল্লোল-কালি-কলম' গোষ্ঠীর সাহিত্য-ভাবনায় তখন দেখা দিয়েছে রবীন্দ্র-বিরোধিতার সুর। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিপর্যয়ে আশাভঙ্গ জীবনদৃষ্টি অনেকের মধ্যে তখন প্রকাশিত। আত্মিক অবক্ষয়ের যন্ত্রণা, দেহ-সর্বস্ব অস্থির প্রেম-চেতনা, অমোঘ নিয়তির অধীনস্থ মানুষের অসহায়তা উল্লিখিত লেখক-গোষ্ঠীর ছোটগল্পে তখন বারে বারে মুখ্য আবেদন হয়ে দেখা দিয়েছে। সমকালের জটিল জীবন-পরিস্থিতি বিভূতিভূষণের দৃষ্টির বাইরে ছিল না। 'সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাত কুমার' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন—

"দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে যে জীবনের প্রতিক্ষেত্রেই অশান্তির সূত্রপাত হয়েছে Totalitarian war-এর ফলে, তা বাহ্যত থেমে গেলেও জাতি-জাতির মধ্যে Cold war রূপে জাতি মাত্রেরই জীবন সমস্যায় সমস্যায় জর্জরিত করে দিচ্ছে। এই হিম-শীতল উত্তরে বাতাসে হাসির দাক্ষিণ্য আশা করা দুরাশা। আর, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের থেকে দূরে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কোথায় আমরা তার প্রভাব থেকে ধীরে ধীরে মুক্ত হব, না অন্ধকার যেন ঘনিয়েই আসছে আরও।

এই কারণটা খুবই স্থূল, উদয়াস্ত প্রতি কাজেই আমরা এর প্রভাব অনুভব করছি। সুতরাং চিত্তের প্রসন্নতা, চিত্তের মুক্তি এবং মোটামুটি একটা নিরুদ্বেগ জীবনযাপনের মধ্যে যে রসের উৎসারণ তা যে বহুলাংশে হবেই বিঘ্নিত এটা না মেনে পারা যায় না।"[১১]

লেখকের 'রাণুর দ্বিতীয় ভাগ' এর প্রথম সংস্করণের ভূমিকা থেকে জানা গেছে গল্পগ্রন্থটিতে তাঁর দেশের সমস্যাভার লাঘব করার প্রয়াসের কথা। বোঝা যায়, দেশ-কালের সমস্যা সম্পর্কে বিভূতিভূষণ সচেতন, তা সত্ত্বেও 'কল্লোল' বা 'কালি-কলম'-এর লেখক-গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র তিনি। শিশুচরিত্র প্রধান ছোটগল্পের প্রেক্ষাপটে বিচিত্র জীবন-পরিবেশ আনলেও ইতিবাদী জীবনপ্রত্যয়ে এই বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করতে পেরেছেন লেখক।

দারিদ্র্যের লাঞ্ছনা, বেকার-সমস্যা ও রাজনৈতিক উদ্বেগ, মূল্যবোধের বিপর্যয়, নাগরিক আত্মকেন্দ্রীকতা, ফ্রয়েডীয় জটিল যৌন-মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি জটিল জীবন-পরিবেশের থেকে পৃথক প্রীতি-মমতা-বাৎসল্য স্নেহে পূর্ণ, প্রচলিত মূল্যবোধে বিশ্বাসী, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যময়, শান্তিপ্রিয় পারিবারিক জীবন আলোচিত গল্পগুলির প্রেক্ষাপট হিসেবে নির্বাচিত। এই প্রেক্ষাপটে যে শিশু চরিত্র ও কিশোর-কিশোরী চরিত্র রূপায়িত প্রেমেন্দ্র মিত্রের তিরিশের দশকের গল্প 'পুন্নাম'-এর খোকার মতো আত্মিক দিক থেকে অসুস্থ নয় তারা, 'মহানগর'-এর রতনের অভিশাপ তাড়া করে ফেরে না তাদের, জগদীশ গুপ্তের 'দিবসের শেষে' গল্পের মতো অমোঘ নিয়তির কঠিন প্রকোপ নেমে আসেনা তাদের ওপর। প্রায় প্রতি গল্পেই বয়ঃসন্ধিক্ষণের কিশোর-কিশোরীরা সঙ্গ পেয়েছে প্রসন্ন-চিত্ত অভিভাবকের—কাকা, জ্যাঠামশাই, মেজকা, নব-বিবাহিতা বৌদি, ঠাকুমা, মা প্রভৃতি বয়স্কর মধ্য দিয়ে তাঁরা আত্মপ্রকাশ করেছেন। সমসাময়িক দেশ-কালের সমস্যায় জর্জরিত নন এই অভিভাবকেরা, পারিবারিক আবহাওয়া ক্লিষ্ট হয় না সমকালীন যুগ-যন্ত্রণার চাপে, ফলে দূষণমুক্ত থাকে কিশোর-কিশোরীর মনোপরিবেশ—অক্ষুণ্ণ থাকে গল্প-পরিবেশের সতেজ, প্রসন্ন ভাবটি।

বংশগত ও পুষ্টিগত কারণ, গর্ভাবস্থায় বা জন্মের পরে আঘাত প্রাপ্তি, আর্থ-সামাজিক পরিবেশ, কৃষ্টিগত পরিবেশ প্রভৃতি বিষয়ের ওপর নির্ভর করে শিশুর দৈহিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ, এ কথা উল্লেখ করা হয় চিকিৎসা বিজ্ঞানে। এখানে আরও বলা হয়, পরিবেশের এই প্রভাবের ওপর নির্ভর করে শিশুর উচ্ছ্বাসময় অথবা বিষণ্ণ মানসিক গঠন। শিশুদের সঙ্গে অভিভাবকের সহিষ্ণু আচার-আচরণ, ইতিবাচক সামাজিক শিক্ষা এবং শিশুকে সহযোগিতার সঙ্গে সঙ্গ দানের ফলে পারিবারিক কৃষ্টির আভ্যন্তরীণ প্রবাহ গ্রহণ করে শিশু। বিভূতিভূষণের গল্পে বিজ্ঞান-স্বীকৃত শিশুর স্বাভাবিক বিকাশের পরিবেশ খুঁজে পাওয়া যায়। ঈশ্বরের প্রতি বিশ্বাস, গুরুজনের প্রতি সম্মান, স্নেহ-মমতা-প্রীতি প্রভৃতি মূল্যবোধে

বিশ্বাস, শিশুর সুশিক্ষা বিষয়ে অভিভাবকের সতর্কতা গল্পগুলির পারিবারিক পরিবেশে দেখিয়েছেন লেখক। তাঁর গল্পে অভিভাবকেরা কখনও শিশু-জগতে পৌঁছতে না পারলে শাসনে লাঞ্ছনায় ব্যথিত হয়েছে শিশু, কিন্তু তাদের এই ব্যথাবোধ সাময়িক কেননা শাসনের পাশাপাশি অভিভাবকের স্নেহময় নৈকট্য তারা পেয়েছে। গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র বিকাশে স্বাভাবিক প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্যের দিকে 'গোলাপী রেশম', 'বর্ষায়', 'ভালবাসা' গল্পে অকালপক্ব ও উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবধর্মে শিশু যখন চালিত তখনও শিশুচরিত্রের ওপর মমতা পোষণ করেছেন বিভূতিভূষণ। অন্যান্য শিশুচরিত্রের তুলনায় চারু, গোবরা, শৈলেন, কুন্তলার এই স্বাতন্ত্র্যের পিছনে বিশেষ পরিবেশের কারণ উল্লিখিত। স্পষ্ট ঋজু স্বভাবধর্মে কখনও বা শিশুসুলভ সারল্যে এই শিশুরা নিজেদের সজীব প্রাণশক্তিকে প্রমাণিত করেছে। বিভূতিভূষণ সৃষ্ট কিশোর-কিশোরী চরিত্র কটি ব্যক্তিত্ববোধ, প্রাণশক্তি ও সুকুমার অনুভূতিতে সতেজ।

বিভূতিভূষণ তাঁর শিশুচরিত্রে অনন্যসাধারণ কোনো মাত্রা যোগ করেননি, পারিবারিক জীবন-সংলগ্ন সাধারণ সুখ-দুঃখ-ব্যথা-বেদনা অনুভবের মানসিকতা তাদের মধ্যে প্রকাশিত। 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপুর চরিত্রে যে ভাব-গভীরতা এনেছেন সেই গভীরতায় ঋদ্ধ নয় তাদের অনুভব-ক্ষেত্র। কিন্তু অফুরন্ত প্রাণ-প্রাচুর্য্য বিভূতিভূষণের প্রায় সব শিশু চরিত্রের বিশেষ সম্পদ। শিশুদের বিচিত্র আত্মপ্রকাশের মধ্য দিয়ে বস্তুতঃ বিভূতিভূষণ উৎসাহ বোধ করেছেন আনন্দিত-মন, প্রাণচঞ্চল শিশুচরিত্র চিত্রণে। দেবতা 'আনন্দ-নট' এ র আনন্দিত, নির্মল নৃত্যছন্দ শিশুর পদশব্দে তিনি যেন ধ্বনিত হতে দেখেছেন। এই প্রত্যয়ে বিভূতিভূষণের হিউমারিট সত্তা দায়বদ্ধ হয়েছে শারীরিক ও আত্মিক স্বাস্থ্যে সতেজ বয়ঃসন্ধিক্ষণের শিশুচরিত্র রূপায়ণে। জীবনরসিক বিভূতিভূষণ সত্য দ্রষ্টার ভূমিকা গ্রহণ করেছেন তাঁর ছোটগল্পে বয়ঃসন্ধিক্ষণের রূপায়ণে। বিজ্ঞান-সমর্থিত স্বাভাবিক কিশোর-কিশোরী হিসাবে পরিচিতি পেয়েছে তাঁর শিশুচরিত্র এবং লেখকের রচনা নৈপুণ্যে ছোটগল্পকে রস-সমৃদ্ধ করেছে তারা।

তথ্যসূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সাহিত্য, বিশ্বভারতী, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৮, পৃ. ৭।
২. সরোজ দত্ত, বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় জীবন ও সাহিত্য সাধনা, রত্নাবলী, কলকাতা, জানুয়ারি ১৯৮৫, পৃ. ১৬৮।
৩. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, আমার সাহিত্য জীবন, রচনাবলী প্রথম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, অগ্রহায়ণ ১৩৮০।
৪. ভবানী মুখোপাধ্যায়, অমৃত ১৭ ভাদ্র ১৩৭২, কলকাতা, 'কাছে বসে শোনা'।
৫. W.E. Nelson, Nelson Text Book of Pediatrics, Igaku - Shoin/Saunders, Japan, 1983, p. 38.
৬. ঐ, p. 21.
৭. ঐ
৮. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, জালিয়াত, রচনাবলী, ৩য় খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, ভাদ্র ১৩৮২, পৃ. ২৮৯।
৯. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, শারদীয়া, রচনাবলী, নবম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, পৌষ ১৩৯০, পৃ. ৮২।
১০. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, 'জীবন', অমৃত, কলকাতা, শারদীয়া, ১৩৮৪।
১১. বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়, সামগ্রিক দৃষ্টিতে প্রভাতকুমার, রচনাবলী, দশম খণ্ড, মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা, শ্রাবণ ১৩৯৩, পৃ. ১৯৬।

ড. সুস্মিতা বন্দ্যোপাধ্যায়
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ,
সুধীরঞ্জন লাহিড়ী মহাবিদ্যালয়, নদীয়া।

পূর্ব ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহ ও ইতিহাস চর্চা

ড. শান্তনু গোলুই

ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী হল আদিবাসী সম্প্রদায়। ভারতীয় সভ্যতার বিবর্তনে ও রূপায়ণে অন্যান্য অনেক জাতির মত আদিবাসীদের অবদানও গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু ইতিহাসের পাতায় আদিবাসীদের সেই জন-সংগ্রাম সেভাবে স্বীকৃতি পায়নি। ভারতের ইতিহাস লেখা হল মূলত রাজরাজাদের, বড়লোকদের, উন্নত সভ্য জাতির অধিবাসীদের। এই আদিবাসীরা অনুন্নত জাতি বলে গণ্য হওয়ায় তাদের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করে লেখা হল না তাদের ইতিহাস। অথচ এরাই বনজঙ্গল কেটে, পরিষ্কার করে বসবাস উপযোগী করে তুলল নিজেদের দেশ। জমি তৈরী করে চাষাবাদ করল, রেলপথ তৈরীতে যোগ দিল। বিনিময়ে তারা ইতিহাসে পরিচিত হল বর্বর জাতি বলে। সহায় সম্বলহীন হয়ে তারা ঘুরে বেড়ালো। খাদ্য-বস্ত্র-বাসস্থানের তাগিদে যখন তারা উদ্দেশ্যহীন তখন বিদেশীদের কাছ থেকে পেল অকথ্য অত্যাচার। বিদেশী জাতির বিরুদ্ধে তারা তীর-ধনুক, বল্লম, টাঙ্গি-তরোয়াল নিয়ে বীরের মত লড়াই করল, কিন্তু ইতিহাসে তাদের সেই লড়াই বিদ্রোহের কোনো মর্যাদা পেল না। তাদের সেই জীবন-মরণ লড়াইকে স্থানীয় হাঙ্গামা বলে চালিয়ে দেওয়া হল। ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তারা স্থান পেল না ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের সংকীর্ণ মনোভাবের জন্য। এখানে ভারতীয় এবং সাম্রাজ্যবাদী ঐতিহাসিকদের মনে রাখা দরকার ছিল রাজনীতির উর্ধ্বে একটা নিরীহ জাতি, যাদের কোনো আদব-কায়দা ছিল না। সহজ-সরল-স্বাভাবিক জীবন-যাপনে যারা অভ্যস্ত তাদের মনে কেন বিদ্রোহের বীজ মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিল। আদিবাসীদের এই সমস্যা সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এ.বি. বর্ধন বলেছেন—

> "No justice can be done to the tribal people, no proper appreciation can be made of their role in shaping India's destiny, without recalling the fact that the tribals were amongst the earliest contingents in the common struggle against the alien rulers and had made some of the greatest sacrifices. Bourgeois historians tend to completely ignore this fact, or in their charitable moments they go so far as to mention them as local revolts–outbursts of elemental tribal fury but without much impact on the course of the freedom struggle. The attempt of the bourgeoisie is to paint the history of the freedom struggle as a movement solely under its ideological influence and conducted according to its programme of action. That is why it is necessary to recall the series of grim battles fought by the tribal people as part of the common heritage of the Indian people's struggle against slavery and exploitation."[১]

ভারতে মোট জনসংখ্যার শতকরা ৮.২% উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার ৫.৫% উপজাতি সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ বসবাস করে। সারা ভারতে প্রায় ৪৬১ টি উপজাতি গোষ্ঠী আছে। এদের 'আদিম জাতি', 'আদিবাসী', 'গিরিজন', 'ট্রাইব', 'অরণ্যচারী' প্রভৃতি আখ্যায় অভিহিত করা হয়েছে। ভারতীয় সংবিধানে এরা 'তপশিল উপজাতি' বা 'Scheduled Tribe' বলে পরিচিত। ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই আদিবাসীদের পাওয়া যায়।

স্বাধীনোত্তর ভারতবর্ষে আদিবাসীদের সমাজজীবন এবং তাদের বিদ্রোহগুলি সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বহু গুণ বৃদ্ধি

গোলুই, ড. শান্তনু : পূর্ব ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহ ও ইতিহাস চর্চা
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 1, June 2019, Page : 36-42, ISSN 2249-4332

পেয়েছে। আদিবাসীরাই যে ভারতের প্রকৃত এবং প্রাচীনতম অধিবাসী এই ধারণাও আজ সমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে। নৃতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিকদের রচনা থেকে আদিবাসীদের সমাজজীবনের নানা বৈশিষ্ট্য তথা তাদের আন্দোলনগুলি সম্পর্কে সহজেই একটা ধারণা তৈরী করা যায়।

আদিবাসী বলতে সাধারণত আমরা আদিম বাসিন্দা অর্থাৎ এদেশের যারা প্রথম বা আদি জনগোষ্ঠী তাদের বুঝে থাকি। কিন্তু ঔপনিবেশিক আমলের পূর্বে কোনো সময়ই ভারতের এই আদিম জনগোষ্ঠী 'Tribe' নামে পরিচিত ছিল না। ইংরাজী 'ট্রাইব' শব্দটি ল্যাটিন শব্দ ট্রাইবুজের (Tribuz) অপভ্রংশ বলে মনে করা হয়। ঔপনিবেশিক আমলে মূলত ১৮০৬ সালে ঔপনিবেশিক প্রশাসকদের উদ্যোগে ভারতীয় জনগোষ্ঠীর শ্রেণীবিন্যাসের কাজ শুরু হলে (যা ১৮৭১ সাল থেকে প্রতি দশ বছর অন্তর চলতে থাকে) ঔপনিবেশিক নৃতাত্ত্বিকের সংজ্ঞায় ভারতীয় আদিবাসীরা ক্রমশ 'Tribe' উপাধিতে ভূষিত হয়ে ওঠে। 'TRIBE' ছিল ইংরেজদের সৃষ্ট একটি বিভাজন নীতির অভিধা। অতি সম্প্রতি সংশোধনবাদী সমালোচকদের প্রদত্ত আদিবাসীদের যে নতুন সংজ্ঞা পাওয়া যায় সেখানে পূর্বতন যে সমস্ত অভিধায় যেমন 'ট্রাইব' (Tribe), 'অরণ্যচারী' (Forest-dweller), 'এদেশীয়' (Indigenous) বলে তারা পরিচিত ছিল সেগুলিকে নস্যাৎ করার প্রচেষ্টা দেখানো হয়েছে। তাদের বক্তব্যের মূলকথা হল আদিবাসীরা বিচ্ছিন্ন একক জনগোষ্ঠী রূপে কোনো দিনই ভারতবর্ষে বিরাজ করেনি।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসীদের অবস্থান

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসী সমাজ ও সংস্কৃতি ছিল অরণ্যকেন্দ্রিক। পশুপালন ও শিকার ছিল তাদের মূল জীবিকা। বনজঙ্গল সাফ করে আদিবাসীরা তাদের গ্রামগুলি গড়ে তুলত গভীর অরণ্যে সাধারণ লোকালয় থেকে বহু দূরে, আবার কোনো সময় পাহাড়ের পাদদেশে জঙ্গল শুরু হওয়ার মুখে। তাই অরণ্য ছিল তাদের জীবন ও সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। বস্তুত জল, জঙ্গল, জমি ছিল আদিবাসী সত্তার প্রধান তিন স্তম্ভ। অরণ্য থেকে তারা শুধুমাত্র তাদের জীবিকা নির্বাহের রসদই পেত না, পাশাপাশি অরণ্য ছিল তাদের পূর্বপুরুষদের স্মৃতি, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও যাবতীয় অনুশাসনের কেন্দ্রস্থল। সাধারণ হিন্দু সমাজের জাতপাতের কলুষতা এবং কুসংস্কার তাই আদিবাসী গ্রামগুলিকে স্পর্শ করতে পারেনি। গ্রামে আদিবাসীদের জীবনযাত্রা ছিল একটি যৌথ পরিবারের মতো। যেখানে কৃষিকাজ থেকে শুরু করে সমস্ত ধরনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কাজগুলি তারা একসঙ্গে একে অপরের সহযোগিতার ভিত্তিতে করত।

প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসী গ্রামগুলিতে সম্পত্তির গোষ্ঠী মালিকানার নিয়ম প্রচলিত ছিল। এই নিয়ম অনুযায়ী গ্রামের সম্পত্তির উপর (জমিজমা ও অরণ্য সম্পদ) সকলের ছিল সমান অধিকার। গ্রামের সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক বা অন্য যে কোনো ধরনের লেনদেন বা ব্যবস্থাপনার মূল উদ্যোক্তা ছিলেন গ্রাম প্রধান। বিভিন্ন আদিবাসীদের সমাজে তিনি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত ছিলেন। প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে আদিবাসী সমাজ ছিল মোটামুটি স্বয়ংসম্পূর্ণ। বিনিময় প্রথার ভিত্তিতে গড়ে ওঠা। অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের মূলকথা ছিল গ্রাসাচ্ছাদন। উদ্বৃত্ত উৎপাদন বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জনের ধারণা ছিল যেমন অনুপস্থিত আবার তেমনি নিজেদের উৎপাদিত ফসলের একটা বড়ো অংশ রাজস্বের নামে প্রদানের জটিল নিয়ম তাদের বোধগম্যের বাইরে ছিল। এইভাবে গ্রাম প্রধানের নেতৃত্বে নিজস্ব ভাষা ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য নিয়ে আদিবাসীরা হিন্দুদের পাশাপাশি থেকেও নিজেদের স্বাতন্ত্র্য, সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

আদিবাসীদের ভৌগোলিক অবস্থান

পূর্বভারত বলতে আমরা মূলত যে ভৌগোলিক পরিসীমার কথা ভাবি তা হল বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা। যদিও এর বাইরে পূর্বভারতের বেশকিছু রাজ্য লক্ষণীয়। পূর্ব ভারতের এই তিন রাজ্যের মধ্যে অবস্থিত ভারতের বৃহৎ সংখ্যক আদিবাসী গোষ্ঠী প্রধানত মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, ওঁরাও, ভূমিজ, সবর, লোধা প্রভৃতি এই ভৌগোলিক সীমার অধিবাসী। এখানের

ভৌগোলিক অবস্থান ছিল পাহাড়-পর্বতে ঘেরা এক সুন্দর প্রাকৃতিক পরিবেশ। বিভিন্ন আদিবাসী লোকগাথা এবং গ্রন্থে এদের সৃষ্টির সাথে প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের প্রায় প্রতিটি রাজ্যেই আদিবাসীদের পাওয়া যায়। তবে সব রাজ্যে সংখ্যায় উপজাতিদের আনুপাতিক হার সমান নয়। যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্যগুলি যথা অরুণাচল প্রদেশ, মিজোরাম, মেঘালয়, ত্রিপুরা, মণিপুর, নাগাল্যাণ্ড ও আসাম এই সাতটি রাজ্যের জনসংখ্যার আনুপাতিক হারে এরা অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় অনেক বেশি। অন্যান্য যে সব রাজ্যে জনসংখ্যায় উপজাতিদের হার আনুপাতিকভাবে উল্লেখযোগ্য তাদের মধ্যে রাজস্থান, গুজরাট, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ, বিহার ও উড়িষ্যার নাম উল্লেখযোগ্য।

আদিবাসী গ্রামগুলির চিত্র

আদিবাসী গ্রামগুলি ছিল জঙ্গলময় পরিবেশের মধ্যে ছোট ছোট মাটির ঘর, খাপড়া বা খড়ের চাল এবং পরিষ্কার করে লেপা-পোঁছা। এই গ্রামগুলি ছিল আদিবাসী সর্দারদের দ্বারা পরিচালিত। এই সমস্ত সর্দারদের অনেক সময় রাজা বলে ডাকা হত। জঙ্গলমহলকে কেন্দ্রে রেখে এর চতুর্সীমা নির্ধারণ করলে দেখা যায় আদিবাসী গ্রামগুলি হাজারিবাগ, গিরিডি, বীরভূম, বর্ধমান ও হুগলীর একাংশ, লোহারদাগা ও সিংভূম এবং উড়িষ্যার জঙ্গলময় কাঁকুরে মাটির পরিবেশে গ্রামগুলি গড়ে উঠেছে কৃষি এবং পশুপালনকে কেন্দ্র করে। এই সকল মানুষগুলোকে মাতিয়ে রাখত তাদের রোজকার কার্যকলাপ, গান, নাচ ও নেশা তাদের চোখে ক্লান্তির ঘুম নিয়ে আসত। এই অঞ্চলে তারাই ছিল সর্বেসর্বাময়। কিন্তু ইংরেজদের আগমন তাদের এই শান্ত জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায়।

আদিবাসী বিদ্রোহের কারণ অনুসন্ধান

গণ্ডগোল শুরু হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সূচনার পর। আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায় কোম্পানির সরকার কর্তৃক রাজস্ব সংস্কার ভারতীয় গ্রামীণ সমাজে মৌলিক পরিবর্তন ঘটায়। তাদের লক্ষ্য ছিল ভারতের চিরাচরিত গ্রামীণ অর্থনীতিকে ধনতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থার আওতাভুক্ত করা এবং ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের পথ সুগম করা। এর ফলে একদিকে কৃষি অর্থনীতির সামন্ততান্ত্রিক পরিকাঠামোটি যেমন ভেঙে পড়ে অন্যদিকে তেমনি কৃষি সম্পর্কের উপর এর বিধ্বংসী প্রভাব পড়ে। জমির ওপরে সম্পত্তিগত অধিকার সৃষ্টি হয়। পরিণামে জমি হয়ে ওঠে বাজারি পণ্য। এরই ফলে প্রথাগত উৎপাদন সম্পর্ক বিনষ্ট হয়ে যায়। চলে আসে চুক্তিভিত্তিক সম্পর্ক। কৃষির বাণিজ্যকরণ বাড়তে থাকে। নজরানার পরিবর্তে উদ্বৃত্ত হিসাবে লভ্যাংশ আদায় চলতে থাকে। কিন্তু পরিবর্তনের প্রক্রিয়াটি কখনোই সম্পূর্ণ হয়নি। অতঃপর নজরানা ও লভ্যাংশ আদায় দুটিই চলতে থাকে। তার ফলে সমস্ত পরিচিত কৃষি সম্পর্কগুলিই আস্তে আস্তে ভেঙে পড়ে।

এই বৃহত্তর প্রেক্ষাপটের আড়ালে আদিবাসী বিক্ষোভের আরো কতকগুলি প্রত্যক্ষ কারণ ছিল। যেমন, ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলি স্পর্শ করলে তাদের বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং তারা ঔপনিবেশিক অর্থনৈতিক নিয়ন্ত্রণের আওতার মধ্যে আসতে বাধ্য হয়। বহু জায়গায় ব্রিটিশ সরকার আদিবাসী সর্দারদের জমিদারের স্বীকৃতি দেয় এবং তাদের অধিকৃত জমিজমায় ভূমিরাজস্ব ব্যবস্থা চালু করে। অনেক জায়গায় রাজস্ব সংগ্রহের ক্ষেত্রে গ্রাম প্রধানদের ভূমিকাকে অস্বীকার করা হয় এবং সরকারি কর্মচারীদের দ্বারা আদিবাসীদের কাছ থেকে রাজস্ব আদায়ের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়াও কোম্পানির পৃষ্ঠপোষকতায় জমিদার, জায়গিরদার, সরকারি আমলা, ব্যবসাদার, সুদখোর মহাজন সমেত আরো বিভিন্ন প্রজাতির মানুষ আদিবাসী অধ্যুষিত এলাকাগুলিতে তাদের প্রভাব বিস্তার করে। এর সঙ্গে যুক্ত হয় খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা। এছাড়াও ঔপনিবেশিক অরণ্য নীতির সাহায্যে সরকার বনভূমি জবরদখল করে বনজ সম্পদ আহরণের উপর এবং বনভূমি ও গ্রামের সমষ্টিগত মালিকানাধীন জমির উপর কঠোর বিধিনিষেধ

আরোপ করে। এইভাবে বহিরাগতদের চাপে আদিবাসীদের জীবন ও সমাজ শোষণ ও অত্যাচারের শিকার হয়। তারা উত্তরোত্তর জমি হারাতে থাকে এবং ক্রমশ খেতমজুর, ভাগচাষি ও করভারে জর্জরিত কৃষক প্রজারূপে বসবাস করতে বাধ্য হয়। এই অবস্থায় পুলিশ প্রশাসন ও অফিস আদালতও আদিবাসীদের কোনোরূপ নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়। এই প্রেক্ষিতে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় আদিবাসী আন্দোলনগুলি দানা বাঁধে।

পূর্ব ভারতের আদিবাসী আন্দোলন সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত

ব্রিটিশ রাজত্বের প্রথম একশো বছরে দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার বা পূর্বভারতে সংগঠিত আদিবাসী বিদ্রোহগুলির মধ্যে সাঁওতাল বিদ্রোহ, চুয়াড় বিদ্রোহ, কোল বিদ্রোহ, ভূমিজ বিদ্রোহ প্রভৃতি উল্লেখ। এই আদিবাসী আন্দোলনগুলির চরিত্র বা প্রকৃতি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মতামত ভিন্নযোগ্য। কালীকিংকর দত্ত তাঁর 'সাঁওতাল ইনসারেকশন' গ্রন্থে আদিবাসী বিদ্রোহগুলি সম্বন্ধে তাঁর মতামত ব্যক্ত করেছেন। তিনি আদিবাসী বিদ্রোহের প্রধান কারণ হিসাবে আদিবাসীদের অর্থনৈতিক টানাপোড়েনের উপর জোর দিয়েছেন। আদিবাসী সমাজ বাংলার মহাজন, সুদখোরদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে সামিল হয়েছিল। এই সুদখোর মহাজনরা সাঁওতাল অধ্যুষিত 'দামিন-ই-কোহ্' অঞ্চলে এসেছিল বিশেষ অর্থনৈতিক সুবিধা লাভের আশায়। তিনি দেখিয়েছেন সাঁওতালরা একদিকে জমিদার ও অন্যদিকে ব্রিটিশ সরকারের রাজস্ব বিভাগের অত্যাচার ও শোষণ এবং সর্বোপরি বহিরাগত ব্যবসায়ী তথা মহাজনদের শোষণে তাদের জমিগুলি হারাতে থাকে ও বংশ-পরম্পরায় ঋণের জালে জড়িয়ে পড়ে। এই অর্থনৈতিক শোষণ ও অত্যাচারের ফলে সাঁওতাল বিদ্রোহ হয়েছিল বলে তিনি মনে করেন। সাঁওতাল বিদ্রোহের মতো তিনি ১৮৩৩ খ্রিস্টাব্দে কোল ও ১৮৯৮-৯৯ খ্রিস্টাব্দে সংঘটিত মুণ্ডা বিদ্রোহের পিছনেও অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেছেন। সুতরাং শ্রী দত্ত এই আদিবাসী বিদ্রোহগুলির পিছনে অর্থনৈতিক কারণের পাশাপাশি কিছু সামাজিক কারণের কথা বললেও তিনি মূলত অর্থনৈতিক কারণের উপরেই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন।

আদিবাসী আন্দোলনের পিছনে যে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আদর্শ কাজ করেছিল সেই আদর্শকে অনেক ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা করেছেন। এস.পি. সিন্‌হা বীরসা আন্দোলনকে ধর্মীয় ও রাজনৈতিক আন্দোলন হিসাবে দেখেছেন। তাঁর মতে আদিবাসী সমাজের ভাঙনের পিছনে বিদেশী সংস্কৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। সিন্‌হা দেখিয়েছেন যে, উপজাতি সমাজ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে হিন্দু ও খ্রিস্টানদের থেকে নিকৃষ্টতম। এই বাইরে থেকে আসা সংস্কৃতি আদিবাসী সমাজের উপর একটা আক্রমণ হিসাবে এসেছিল। এই আক্রমণের ফলে উপজাতি সমাজের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে গিয়েছিল। ফলে তাদের মধ্যে জাতে ওঠার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। সেই কারণে বীরসা এই অনুপজাতীয় সংস্কৃতি থেকে বেশ কিছু সাংস্কৃতিক উপাদান সংগ্রহ করেছিল।

সিন্‌হা দেখাতে চেয়েছেন যে, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক আমলে বিভিন্ন কারণে আদিবাসী সমাজে বিচ্ছিন্নতার অবসান ঘটে এবং আদিবাসী এলাকায় হিন্দু ও খ্রিস্টানদের সাংস্কৃতিক প্রভাব বৃদ্ধি পায়। এইসব উন্নত সংস্কৃতির প্রভাব আদিবাসীদের উপর পড়লে তারা হীনমণ্যতায় ভোগে। তাই এই বিদ্রোহের নেতারা আদিবাসীদের আন্দোলনে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাদের উন্নত জীবন ধারণের প্রতি আদিবাসীদের উদ্বুদ্ধ করেছিল বলে সিন্‌হা মনে করেন।

আদিবাসী আন্দোলনগুলি সম্পর্কে এক ভিন্নধর্মী ব্যাখ্যা দিয়েছেন জন ম্যাকদুগাল। তিনি 'Land or Religion : The Sardar and Kherwar Movement in Bihar 1858-1895' গ্রন্থে বলেছেন আদিবাসী আন্দোলনগুলি ছিল আদিবাসী সমাজের কৃষকীকরণের ফল। তিনি সর্দার ও খেরওয়ার আন্দোলনের মধ্যে তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে দেখিয়েছেন যে, উভয় আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃতিগত ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়।

ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে তাঁর 'সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস' নামক গ্রন্থে আদিবাসী আন্দোলন সম্পর্কে তাঁর ধারনা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে, সাঁওতাল বিদ্রোহ হল ঔপনিবেশিক শাসনের বিরুদ্ধে একটা সচেতন রাজনৈতিক প্রতিবাদ।

সাঁওতাল বিদ্রোহ একদিকে ছিল জমিদার ও মহাজন বিরোধী এবং অন্যদিকে ব্রিটিশ বিরোধী। কোল বিদ্রোহের মতো সাঁওতাল বিদ্রোহের আসল উদ্দেশ্য ছিল তাদের নিজ এলাকায় নিজস্ব রাজ প্রতিষ্ঠা করা। বিনয়ভূষণ চৌধুরী একে একটু সংশোধন করে বলেছেন, নিজেদের 'রাজ পুনঃস্থাপন'। এই যে নিজেদের 'রাজ পুনঃস্থাপন' এটা হবে বহিরাগত (দিকু) -দের এদেশ থেকে তাড়িয়ে।

ব্রিটিশ শাসন ও শোষণের কবল থেকে মুক্তিলাভ করার জন্য দলে দলে সাঁওতালরা সেদিন আপোসহীন স্বাধীনতা সংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। এই সংগ্রামে পরাজয় ছিল কিন্তু আপোস ছিল না। কারণ এই সংগ্রামের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্যের প্রতিষ্ঠা। সাঁওতাল বিদ্রোহের পশ্চাতে ছিল জমির উপর একচ্ছত্র অধিকার প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষা ও তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল স্বাধীন সাঁওতালদের স্বাধীনতা স্পৃহা, যার ফলে তারা ধ্বনি তুলেছিল নিজ দলপতির অধীনে সাঁওতাল রাজ্য চাই। সমসাময়িক সাঁওতাল গুরু কলিয়ান হাড়ামের শিষ্য জুগিয়া হাড়াম সাঁওতাল বিদ্রোহের ইতিবৃত্ত বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন—

> ''খান্‌গে সিদো আর কানহকিন হুকুমকেৎআ, রাজ আর সাউ যতবোন গচ্‌, চাবাকোওয়া আর দসার দেকো দে গঙ্গা পারমতেবোন লাগাকোওয়া, আবোনাঃক্‌ রাজগে হোয়োঃক'অ্‌।''

অর্থাৎ সিদো আর কানহো বলল, আমরা রাজা মহাজনদের সবাইকে খতম করব, পরে হিন্দু ব্যবসায়ীদের গঙ্গার ওপারে তাড়িয়ে দিব, আমাদেরই রাজ্য হবে।

অতি বাস্তব কথা হল অরণ্য রাজ্যে সুখে-শান্তিতে বাস করার জন্য তারা জমি করেছে, গ্রাম বসিয়েছে, শান্তির দেশ গড়ে তুলেছে। সেই শান্তি আজ নষ্ট হতে চলেছে। তাদের শ্রমের অংশ লুঠ করে নেবার জন্য কোম্পানির অনুগত জমিদার ও মহাজন ব্যবসাদার দল হাত বাড়িয়েছে। সাঁওতালরা এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানালেও ব্রিটিশ সরকার কোন কর্ণপাত করেনি। ফলে তাদের সহ্যের সীমা যখন অতিক্রম করল তখন তাদের বহুদিনের জমানো ক্ষোভ বিক্ষোভে ফেটে পড়ল। সাঁওতালদের এই বিদ্রোহ ঘোষণা শুধু স্বাধীনতার জন্যই। বিদেশীদের ইতিহাসে তারা বন্য, অসভ্য, বর্বর বলে পরিচিত হল একমাত্র তাদের স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্যই। পরবর্তীকালে ডব্লিউ.জি.আর্চার লিখেছেন—''এটা এখন সকলেই স্বীকার করেন যে সাঁওতাল বিদ্রোহের একটা গভীরতর, অন্ততঃপক্ষে অতিরিক্ত কারণ হচ্ছে সাঁওতালদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ....।'' যখন তাদের মাথার উপরে কোনো উৎপীড়ক চেপে বসেনি সেই প্রাচীন অতীত দিনের স্বপ্নকে তারা বাস্তবায়িত করতে চেয়েছিল।

বাস্কে বলেছেন—স্বাধীন সাঁওতাল রাজ্য স্থাপন ও মানুষের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করাই ছিল সাঁওতাল বিদ্রোহের মূল লক্ষ্য। এ ব্যাপারে আপোসহীন সংগ্রামের আদর্শই তারা দেশবাসীর সামনে তুলে ধরেছিল। ইংরেজ আমলে জমিদার ও মহাজনরাই ছিল ইংরেজদের রক্ষাস্তম্ভ। তাদের আড়াল থেকেই শাসক শ্রেণী ভারতের কৃষক সমাজকে শাসন ও শোষণ করত। তাই সাঁওতালরা জমিদার ও মহাজনদের উচ্ছেদের মধ্যে দিয়ে ব্রিটিশ শাসনকে উৎখাত করতে চেয়েছিল। তাই ধীরেন্দ্রনাথ বাস্কে ঐতিহাসিক মহলে এই প্রশ্নই তুলে ধরেছেন যে, এই সব সত্ত্বেও বলতে হবে সাঁওতাল বিদ্রোহ সাম্রাজ্যবাদী শোষক ও উৎপীড়কদের বিরুদ্ধে একটা সচেতন বিদ্রোহ নয়।

মার্টিন ওরান্স আদিবাসী আন্দোলনের পিছনে বিদ্রোহী ধর্মগুরু বা অবতারদের প্রভাব প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন। সাঁওতালরা আন্দোলন শুরু করেছিল এই বিশ্বাসে যে ব্রিটিশ সরকার সমেত সমস্ত বহিরাগতদের বিতাড়িত করে তারা পূর্বতন যুগের সোনালী দিনগুলি ফিরিয়ে আনবে। অর্থাৎ এই ধর্মগুরুরা আদিবাসীদের হস্তচ্যুত রাজ্যকে ফিরিয়ে আনার একটা প্রত্যাশা জুগিয়েছিল। যেখানে কোনো অভাব থাকবে না, ঘরে যথেষ্ট খাবার থাকবে ও আগেকার প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশের পুনর্বহাল ঘটবে।

অধ্যাপক বিনয়ভূষণ চৌধুরী আদিবাসী আন্দোলনগুলি সম্পর্কে নতুন বৈশিষ্ট্য উপস্থাপিত করেছেন। সেটা হল আদিবাসী আন্দোলনগুলির 'মিলেনারিয়ানিজম্‌'-এর চরিত্র। অধ্যাপক চৌধুরী দেখিয়েছেন, যখন অর্থনৈতিক টানাপোড়েন

নিঃসন্দেহে তাদের অবস্থা দুর্বিসহ করেছিল তখন এই ধরনের আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল। কারণ তাদের এই দুর্বিষহ অবস্থার সময়ই বহিরাগত জমিদার বা দিকুরা তাদের উপর আধিপত্য বাড়াতে থাকে। এটাই ছিল বিদ্রোহের প্রধান কারণ। তিনি দেখিয়েছেন, ঔপনিবেশিক আমলে দীর্ঘদিন ধরে দুঃসহ অত্যাচার ও শোষণের এক দুর্বিষহ পরিবেশের মধ্যে থাকতে থাকতে আদিবাসীরা ক্রমশ এই উপলব্ধিতে পৌঁছায় যে ঔপনিবেশিক সরকার তাদের যথেষ্ট ভরসা জোগাতে ও প্রয়োজনীয় নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ। উপরন্তু তারা জমিদার, মহাজন ও ব্যবসায়ীদের পক্ষ অবলম্বন করে আদিবাসী শোষণের মাত্রা বৃদ্ধিতে সাহায্যে করেছে। এই পরিস্থিতিতে অগত্যা তারা সেখানে নিজেদের উদ্যোগে এক স্বাধীন বিকল্প ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সচেষ্ট হয়।

আদিবাসী আন্দোলনগুলির পিছনে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ভাবাদর্শের পাশাপাশি অনেকে শ্রেণী সংগ্রামের অস্তিত্ব খুঁজে পেয়েছেন। যেমন, প্রভুপ্রসাদ মহাপাত্র। তিনি ছোটনাগপুর অঞ্চলের উপর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি এখানে জমিদার ও কৃষক উপজাতিদের মধ্যে একটা ধারাবাহিক দ্বন্দ্ব পর্যবেক্ষণ করেছেন। যা মূলত শ্রেণী সংগ্রামের নামান্তর। তিনি ছোটনাগপুরের আদিবাসী অঞ্চলে কর নিয়ে বিশৃঙ্খলা, শ্রেণী কাঠামো, শ্রেণীদ্বন্দ্ব এবং উদ্বৃত্ত নিষ্কাশনের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে অনুসন্ধান করেছেন। আদিবাসী কৃষক ও জমিদারদের মধ্যে জাতিগত ও শ্রেণীগত বৈষম্য ছিল প্রকট। কারণ জমিদারদের অধিকাংশই ছিল বহিরাগত, যারা এসেছিল বিহারের সমতলভূমি থেকে। আদিবাসী চেতনা বা সংস্কৃতি সম্পর্কে তাদের কোনো সহানুভূতি ছিল না এবং এই কারণে তারা ক্রমশ শোষণের মাত্রা বাড়িয়ে চলেছিল।

মূল্যায়ন

ভারতবর্ষের ইতিহাসে আদিবাসী আন্দোলন একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। আমার আলোচ্য বিষয় 'পূর্ব ভারতের আদিবাসী বিদ্রোহ ও ইতিহাস চর্চা'। উপরিউক্ত আলোচনাতে এর প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আদিবাসীরা ভারতের প্রাচীনতম অধিবাসী এবং তারা পাহাড়ের পাদদেশে ও জঙ্গলের মধ্যে শান্তিতে বসবাস করত। কিন্তু ব্রিটিশ শাসন শুরু হলে জঙ্গলের উপর ও আদিবাসী গ্রামগুলির উপর, তাদের জমির উপর হস্তক্ষেপ শুরু হয়। তাদেরকে শোষণ করে ও মহিলাদের উপর অত্যাচার চালায়। এর সঙ্গে যুক্ত হয় জমিদার ও মহাজনরা। এর ফলে আদিবাসীরা বিদ্রোহ করে।

আদিবাসীদের মধ্যে অন্যতম সম্প্রদায় ছিল সাঁওতালরা। এদের বিদ্রোহের কারণ হিসাবে তাদের অসন্তোষ, অধিকার ও স্বাধীনতার কথা পাওয়া যায়। সাঁওতালরা চিৎকার করে বলেছিল—

"নেরা নিয়া, নুরু নিয়া
ডিঁডা নিয়া, ভিটা নিয়া,
হায়রে হায়রে! মাপাঃক্'গপচ্'দ,
নুরিচ্' নাঁড়াড় গাই-কাডা, নাচেল লীগিৎ পাচেল লীগিৎ,
সেদায় লেকা বেতাবেতেৎ এ্গাম রুওয়ীড় লীগিৎ
তবে দে বোন হুল গেয়া হো।"

এর অর্থ সম্পর্কে বলা যেতে পারে—

স্ত্রী-পুত্রের জন্য,
জমি-জায়গা বাস্তু-ভিটার জন্য,
হায়! হায়! এ মারামারি, এ কাটাকাটি
গো-মহিষ লাঙ্গল ধন-সম্পত্তির জন্য,
পূর্বের মত আবার ফিরে পাবার জন্য
আমরা বিদ্রোহ করব।

ব্রিটিশরা যুক্তি দিয়েছিল ঐ সমস্ত অঞ্চল বা আদিবাসীদের উপর তারা হস্তক্ষেপ করছে এই কারণে যে, তারা আদিবাসীদের উন্নতি ঘটাতে চায় সমস্ত দিক দিয়ে। কিন্তু এটা উন্নয়ন ছিল না, এটা ছিল শোষণ। এর ফলাফল হিসাবে আদিবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করে। কোথাও ভিন্ন ভিন্ন চরিত্র নিয়ে, কোথাও ছিল আবার স্বাধীনতার জন্য। যেমন সাঁওতাল বিদ্রোহ। বিদেশী ইতিহাসে তারা বন্য, অসভ্য ও বর্বর বলে পরিচিত হল একমাত্র তাদের স্বাধীনতা প্রিয়তার জন্যই। এই আন্দোলনগুলি গড়ে ওঠার পিছনে ঐতিহাসিকরা ভিন্ন ভিন্ন কারণ দেখিয়েছেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিক এই উপজাতি বিদ্রোহকে জমিদার, মহাজনদের শোষণকে তুলে ধরতে অর্থনৈতিক কারণকে দায়ী করেছেন। এছাড়াও, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, জাতীয়তাবাদী ও শ্রেণী সংগ্রাম চরিত্রের প্রতি আলোকপাত করেছেন।

স্বাধীন ভারতে আদিবাসী উন্নয়নের বিষয়টি একই সঙ্গে বিতর্কিত এবং বহুল চর্চিত। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরই এই বিষয়ে বহু বিখ্যাত নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিক আদিবাসীদের উন্নয়নের প্রশ্নে নিজেদের সুচিন্তিত মতামত জ্ঞাপন করেছেন। সেগুলিকে কয়েকটি মডেল রূপে তুলে ধরা যায়। প্রথমত, ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে যুক্তরাষ্ট্রের মাধ্যমে ভারতবাসীর সাথে আদিবাসীদের উন্নতির কথা ভাবা হয়। দ্বিতীয়ত, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা করে উন্নয়ন। কিন্তু তাদের উন্নয়নের ক্ষেত্রে বাধা ছিল। এর মূল কারণ হল দুটি—(১) প্রশাসনিক ব্যর্থতা ও অযোগ্য কর্মচারীদের হাতে আদিবাসী উন্নয়ন প্রকল্পটি রূপায়ণের দায়িত্ব থাকায় এগুলি ঠিকমতো বাস্তবায়িত হয়নি। (২) আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিতে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার স্বার্থে বহুজাতিক সংস্থাগুলির অবাধ প্রসার। তা পরিবেশকে দূষিত করছে। তাই আদিবাসীরা আজ বিপন্ন।

একথা অস্বীকার করার উপায় নেই আজ একবিংশ শতাব্দীতে আদিবাসী সমাজ আর তার প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলের আদিবাসী জনজীবনের বৈশিষ্ট্যগুলিকে আঁকড়ে নেই। আদিবাসী সমাজ, সংস্কৃতি ও দৃষ্টিভঙ্গিতে আজ অনেক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

ভারতের সংবিধানের ধারায় তাদের সংস্কৃতি রক্ষা এবং তাদের শিক্ষাগত ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে বন্দোবস্ত করা হয়েছে তার ফলে আদিবাসীরা আজ কিছুটা হলেও শিক্ষায় ও অর্থনৈতিক উন্নতিতে সামিল হতে পেরেছে। আদিবাসী সমাজেও এক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উন্মেষ ঘটেছে এবং সেখানে শ্রেণীবৈষম্য লক্ষ্য করা যায়। তবে একথা স্বীকার্য আদিবাসীরা আজ মূলস্রোতের জীবনধারা থেকে পৃথক নয়।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. Bardhan, A.B.–The Unsolved Tribal Problem.
২. Dutta, K.K.–Santal Insurrection
৩. Sarkar, Tarika–Jitu Santal's Movement in Malda : 1924-32.
৪. Dasgupta, Swapan–Adivasi Politics in Midnapore.
৫. Martin Orans–The Santal, A Tribe in Search of Great Tradition.
৬. বাস্কে, ধীরেন্দ্রনাথ—সাঁওতাল গণসংগ্রামের ইতিহাস।
৭. রায়, সুপ্রকাশ—ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম।
৮. রায়, সুপ্রকাশ—মুক্তিযুদ্ধে ভারতীয় কৃষক।

ড. শান্তনু গোলুই
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ,
নিখিলবঙ্গ শিক্ষণ মহাবিদ্যালয়, বিষ্ণুপুর।

Lac Production in India : A Study

Dr. Malay Kumar Ghosh

Abstract

Lac is one of the most precious material provided by nature and applied in different industries in the world. A considerable number of people are engaged in lac cultivation in the world. India is the largest producer of lac in the world and contributes around 70% of the world's need. This paper attempts to bring forward the scenario of lac cultivation and lac production in India as far as possible.

Key words : Lac, Rangeeni, Kusmi, Cultivation, Production.

Introduction

Lac, a unique material gifted by nature for use of various purposes of mankind, is a resinous secretion of lac insect.The lac insect is actually one species namely "Laccifer Lacca" in the major lac growing areas and two main strains of lac i.e. Rangeeni and Kusmi with minor morphological difference produce different types of resin (Glover, 1937). Various lac host plants such as Kusum, Ber, Palasetc. are in practice in India, utilised for lac cultivation purposes. In India, 113 species of lac host plants, out of which 14 common hosts, 14 occasional hosts and the rest 85 rare hosts mainly produce lac (Roonwal, 1958).The lac host plants are successful in the environment ensuring free circulation of air (Mahdihassan, 1957). The strain Rangeeni grows on Palas, Ber etc.whereas Kusmi on Kusum and some other species of lac host plants. Two crops are obtained from Rangeeni strain - Baisakhi and Katki, likewise two crops from Kusmi - Jethwi and Aghani (Mukhopadhyay, and Muthana, 1962). The systematic cultivation can be executed either with a single species of lac host plants known as pure cultivation or with two species of lac host plants known as mixed cultivation. In case of mixed cultivation, alteration of host plants generally takes place. Various system of both pure and mixed systematic cultivation can be possible (Srinivasan, 1956e).

Among main lac producing countries in the world, such as India, Thailand, Indonesia, parts of China, Vietnam, Cambodia, Philippines etc., India ranks top position. Lac cultivation is considered as a vital source of income of the forest and sub-forest dwellers of India. Such people of Jharkhand, Chhattisgarh, West Bengal, Madhya Pradesh, Maharashtra,parts of Gujarat, Uttar Pradesh, Andhra Pradesh and NEH region cultivate lac side by side with other activities for livelihood. Lac cultivation is mainly a labour-based work where both men and women can participate and the lac growers in their turn, with hard labour all day long, grow abundant crops which supplyhigh economic returns to them. Again it brings huge foreign exchange as some foreign countries like Germany, U.S.A, U.K, Pakistan, Bangladesh, Chinaetc. import immense Indian lac and lac products which enriches the treasury of India (Lac, Plant

Ghosh, Dr. Malay Kumar : Lac Production in India : A Study

Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 1, June 2019, Page : 43-48, ISSN 2249-4332

Resin and Gum Statistics 2016).

Objectives of the Study

The major objectives of the study may be briefed as follows :

1. To highlight the concept of lac.
2. To study the lac production scenario in India.
3. To identify the problems of lac production in India.
4. To suggest some measures to augment lac production.

Methodology adopted for the Study

The present study is mainly based on the secondary data available in Books & Journals, Reports, Lac Statistics and various Web Resources. The data are presented in tabular form.

Lac Production Scenario in India

The lac is cultivated in forest areas by the Forest Departments but not with their full capacity due to the fact that these departments consider it as a minor forest produce. In spite of that, as lac can be a more potential source of revenue through making high returns almost in every year as compared to other forest produces like timber, fuel coupes etc which can earn revenue in cycles of long years, the state governments take care of it and are initiating various schemes for lac cultivation in forest belts (Krishnaswami, 1957). For the betterment of lac sector, various policies, research and developmental works have been initiated during 2010s at grass root level which has supported the interest of the stakeholders to a great extent. Presently, a very few i.e. less than 5% lac host plants are exploited for lac cultivation (Lac, Plant Resin and Gums Statistics 2016).Lac is cultivated in a number of states in India. Around 3 to 4 millions of Indian people are engaged in lac cultivation (Report, Govt. of W.B. 2010-11).

Table : 1 Lac Production in India during 2015-16 (in tons)

Name of States/ Districts	Name of Lac Crops				Total
	Baisakhi	Jethwi	Katki	Aghani	
Jharkhand	825	4935	785	3405	9950
Chhattisgarh	622	765	600	1200	3187
Madhya Pradesh	1670	66	425	61	2222
Maharashtra	860	0	605	0	1465
Odisha	65	118	75	365	623
West Bengal	150	62	235	135	582
Assam	65	0	250	0	315
Andhra Pradesh	60	5	100	7	172
Meghalaya	120	0	7	0	127
Uttar Pradesh	15	0	40	0	55
Gujarat	20	20	3	5	48
Total	4472 (24%)	5971 (32%)	3125 (17%)	5178 (27%)	18746

Source: Lac, Plant Resin and Gums Statistics 2016: At a Glance, IINRG

Table : 1 shows that during the year 2015-16, quantity of sticklac production was 18746 tons comprising Rangeeni (7597 tons) and Kusmi (11149 tons). Among all the lac producing states, Jharkhand possessed the supreme position growing 9950 tons followed by Chhattisgarh 3187 tons, Madhya Pradesh 2222 tons, Maharashtra 1465 tons, Odisha 623 tons and so on.About 93% of national lac production was contributed by these five states. Around 53% of national lac production was contributed by Jharkhand, then 17% by Chhattisgarh, 12% by Madhya Pradesh, 8% by Maharashtra and the rest 10% by Odisha, West Bengal, Assam& other states all together. Gujarat was in the lowest position growing only 48 tons.

In total lac production, the crop Jethwi (Summer season crop of Kusmi) with 32% was in the top position followed by Aghani (Winter season crop of Kusmi), Baisakhi (Summer season crop of Rangeeni) and Katki (Rainy season crop of Rangeeni) with 27%, 24% and 17% respectively.

During 2015-16, 10% increase in lac production was observed as compared to last year. In comparison to 2014-15, during 2015-16, an increase of 12%, and 8% in production of Kusmi and Rangeeni respectively was noticed and the crop, Jethwi was increased by 33%, Baisakhi by 12% and Katki by 4% however Aghani was decreased by 6%.

Table: 2 Top Ten Lac Producing Districts in the Country

Districts (States)	2014-15	Rank	2015-16	Rank
Ranchi (Jharkhand)	2530	1	3190	1
Simdega (Jharkhand)	1910	2	2020	2
Khunti (Jharkhand)	1380	3	1610	3
Gumla (Jharkhand)	1330	4	1605	4
Seoni (Madhya Pradesh)	1165	5	900	7
Gondia (Maharashtra)	1100	6	1100	5
Balaghat (Madhya Pradesh)	882	7	741	9
West Singhbhum (Jharkhand)	860	8	825	8
Korba (Chhattisgarh)	750	9	1010	6
Kanker (Chhattisgarh)	510	10	705	10

Source: Lac, Plant Resin and Gums Statistics 2016: At a Glance, IINRG

Table: 2 highlights the position of the districts Ranchi, Simdega, Khunti, Gumla and West Singhbhum of Jharkhand and Kanker of Chhattisgarh where they held same rank in lac production in both the years whereas the remaining districts could not keep their position. But the overall production is hopeful and an increasing trend is noticed.

Table: 3 Lac Production in India during 2011-12 to 2015-16

Year	Production (in tons)
2011-12	17900
2012-13	19577
2013-14	21008
2014-15	16978
2015-16	18746

Source: Lac, Plant Resin and Gums Statistics 2016: At a Glance, IINRG

Table: 3 depicts an upward trend in lac production except in 2014-15 where a decline is noticed in comparison to previous year. But the overall situation looks advancing.

Problems of Lac Production in India

Lac cultivation in India confronts with numerous problems. As a result, lac production is being hampered massively in India. Some of the major problems relating to lac production in India are summarised below [(Mukhopadhyay and Muthana, 1962), (Annual Report, 2017-18), (Report, Govt. of W.B.2010-11), (Lac, Plant Resin and Gums Statistics 2016)].

(i) Insufficiency as well as low quality of broodlac; (ii) insufficiency of instruments; (iii) production damage by fog, heavy rain, high temperature, hail storm and other adverse climatic condition; (iv) existence of parasites, predators, other natural enemies, pests of lac hosts & lac insects. Other important problems include (v) illiteracy and ignorance of lac growers; (vi) poor financial condition of lac growers; (vii) Weak communication with remote lac growing belts; (vii) absence of regulated market for lac products; (ix) High price fluctuation of lac products ; (x) Cutthroat competition in international markets due to invention of synthetic resin; (xi) Less use of modern technology in lac cultivation and (xii) insufficient government measures regarding free broodlac & instruments supply, training programmes etc. for lac growers.

Findings of the Study

After going into a thorough study on lac production in India, the following findings are observed :

1. A very few lac host trees are used for lac cultivation purposes.
2. Lac production in India confronts with numerous problems.
3. The government initiatives towards lac cultivation are not noteworthy.
4. Some of the states in India produce major quantity of lac and the others are not.
5. The trend of lac production in India is upward and also satisfactory.

Suggestions

For the betterment of lac production in India, some measures are recommended below :

1. More and more lac host trees should be utilised for lac cultivation purposes.
2. Proper research work is essential for lac cultivation to combat with the problems.
3. The government should come forward to help the lac growers by making arrangement for sufficient supply of quality broodlac &instruments, adequate training camps, proper education, subsidised loan facilities, well infrastructure, regulated market etc.
4. The lac growers should be cautious enough to use modern method of lac cultivation.
5. Last but not the least, massive campaign is a must for more use of lac products to avoid synthetic resin.

Conclusion

Lac, a gift of nature, has an immense value and has gained a commendable position in economic sector in India as a majority of tribal population of forest and sub-forest belts as well as people of some other communities in different states meet a portion of their livelihood from earning relating to lac in one hand and on the other hand, a considerable amount of foreign exchange can be earned by India from exporting of lac to different countries of the world after fulfilling the indigenous demand. But lac cultivation is not an unmixed blessing because of a lot of draw backs. The government has initiated some measures but these are not sufficient in comparison with the needs. Both the central as well state governments, lac growers, processors, traders, exporters, policy makers and the society as a whole should fight neck to neck to augment the lac cultivation. It is noticedfrom a thorough careful study that in spite of some problems, average production of lac since 2011-12 to 2015-16 is satisfactory. In fine, it may beremarked that if the remedial measures are taken properly by the concerned parties, the undesirable obstacles will disappear to a great extent from lac cultivation and lac will bring a financial prosperityleading to an increase in socio-economic status of the people of the country and the countrymen will be expected to encounter pompous bed of roses in near future.

References

Books and Journals

1. Bhowmik, T. and Mukherjee, S.K. (1961), Essay of Sticklac Research & Industry, 6, No.2. pp. 47-48.
2. Glover, P.M. (1937), Lac Cultivation in India. 8+147, pp. 9, figs.16 pls Ranchi.
3. Krishnaswami, S. (1957), The Lac Industry and Forest "Southern Forest Rangers College Mag. Forest Industries Special Number", 33.No.3.pp 89-93.
4. Lohot, Vaibhav D., Ghosh,J.,Ghosal,S.,Gunjan,Thamilarasi K.Sharma, K.K.-(2018) " Effect of Lac Cultivation on Seed quality traits of Pigeonpea [Cajanus cajon(L.) Millsp.]", E-ISSN 2320-7078, P-ISSN 2319-6300, pp 2296-2301.
5. Mahdihassan, S. (1957), Experimental Studies of the Life Cycle of the Sind lac insect,

Indian J, Ent. New Delhi, 19 Part (2), pp. 107-131.
6. Mukhopadhyay, B. and Muthana, M. S. (1962), A Monograph on Lac, Indian Lac Research Institute, Namkum, Ranchi.
7. Pal Govind, Jaiswal, A. K. and Bhattacharya, A. (2009-10), A Survey Report, IINRG Namkum, Ranchi.
8. Roonwal, M.L. (1958), Descriptive Account of The Host Plants of the Lac Insect Laccifer lacca (Kerr) and the Allied Plants in the Indian Region Part-1. pp. 1+1-132 (IPL) Ranchi (Indian Lac Cess Committee).
9. Srinivasan, M.M. (1956e), Lac, its Cultivation and Manufacture in India (Chapter-1. Introduction) Indian Forester, Dehra Dun, 82 (i) pp. 5-7.

Reports

10. Annual Report 2017-18, ICAR-Indian Institute of Natural Resins and Gums.
11. A Report on Achievement of Lac Development Programme in Purulia District, (2010-11), Government of West Bengal, Directorate of Micro and Small Scale Enterprises, Lac Development Office, Purulia.
12. Industrial Uses of LAC (1985), Shellac Export Promotion Council, World Trade Centre, 14/1B, Ezra Street, Calcutta.
13. Lac Development Programmes. Retrieved from http://www.mssewb.org/htm/lac industries.html
14. Lac Development Scheme. Retrieved from http://www.india.gov.in
15. Lac, Plant Resin and Gums Statistics 2016: At a Glance. IINRG.

Web Resources

16. https://icar.org.in/note/806/
17. http://iinrg.icar.gov.in/annualreport.pdf
18. http://www.researchgate.net/…/330441724
19. https://www.researchgate.net/.../323846755_Recent_advances_in_lac_production_techn..
20. mksp.swalekha.in/FrmNTFP_ScientificLac_Cultivation.aspx.

Dr. Malay Kumar Ghosh
Assistant Professor
Department of Commerce
Sidho-Kanho-Birsha University

MGNREGA and Awareness Indicator of Empowerment A Case Study

Arindam Chakraborty

Abstract

The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (hereinafter MGNREGA or MNREGA) aims at enhancing livelihood security by ensuring 100 days of casual employment in financial year to every rural household on public works at the statutory minimum wage. It contains special provisions to ensure higher participation of women in the process. As the scheme has converted some of the unpaid hours of the women into paid hours it has started to change their status in the family as well as in the society. The paper tries to evaluate the awareness indicator of empowerment on the basis of micro level data.

Key words : MGNREGA, Empowerment, Awareness

Introduction

Empowerment is as sacred word as religion. In recent time, empowerment of the margins especially the women has emerged as an important issue in our society. Empowerment particularly the economic empowerment of women is being considered these days as a sine-qua-non of progress for a country. So the issue of economic empowerment of women is of utmost importance to all sections of society (Shashi Kumar, 2008, p. 1). The Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, the flagship programme of India has emerged as not only one of the largest promotional social protection programmes in India (Malla, 2014, p. 109) but also the largest ever social safety net programme in the world as well(Liu & Deininger, 2010, p. 2), (Sinha, 2011, p. 9). It has rightly reserved the rights of the women by ensuring at least 33 percent participation in the worksite. MNREGA initiated in West Bengal in a phased manner like other parts of the country has offered substantial employment opportunities in different districts and the state as a whole thereby leading to empowerment of the rural women folk economically. The paper on the basis of micro level data tries to evaluate the awareness indicator of empowerment.

Data and Methodology

For analytical purpose the study is based on primary data only. For collection of primary data an extensive survey has been carried out during 2016-17 at the household level in eight Gram Panchayats selected randomly from four Blocks of Nadia District of West Bengal. The sampling procedure is multi-stage one.

In Nadia there are 17 Blocks. In the first stage, out of 17 Blocks four Blocks namely Chakdaha, Krishnaganj, Nakasipara and Santipur have been selected randomly. From these

Chakraborty, Arindam : MGNREGA and Awareness Indicator of Empowerment : A Case Study
Open Eyes, Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas, Volume 16, No. 1, June 2019, Page : 49-57, ISSN 2249-4332

four Blocks eight Gram Panchayets have been chosen randomly again in the second stage. Now from our data it reveals that Hingnara and Sarati from Chakdaha, Bhajanghat-Tungi and Taldah Majdia from Krishnaganj, Birpur-II and Patikabari from Nakasipara and Belgoria-I and Fulia Township from Santipur Block have been selected for our purpose. In the third stage, 500 odd women working in the MNREGA works have been selected from these Panchayets and surveyed with structured questionnaire consisted of the variables relating to the objectives and concepts of the study.

Socio-economic Profile

In Table-1 socio-economic profile of the sample has been presented. We find a representation of the women across the castes, although unevenly in our sample. While there are 15.2 percent general category women, 36.2 percent are Scheduled Castes consisting of more than 1/3rd of the sample, 28 percent are Scheduled Tribe and rest 20.6 percent are from OBCa category.

Table-1 : Profile of the Women Workers

Category	Gen	SC	ST	OBCa	Illiterate	APL	BPL	IAY
%	15.2	36.2	28	20.6	58.6	41.4	58.6	14.6

Source : Survey data

In general the women in the sample have lower literacy rate. Only 41.4 percent women have been found to be literate. The table also provides data on poverty. Poverty can be defined as the inability of an individual to secure a normative minimum level of living or to attain some basic needs of life. This normative minimum defines the poverty line in terms of money per capita per month living below which a person is deemed to be poor (Planning Commission, 2014). For identifying poverty level the study has amassed data on three accounts, namely APL, BPL and the IAY beneficiary. Around 58.6 percent women in the sample hail from BPL families out of which 73 families consisting 14.6 percent of total households have got the IAY benefits as they are poor to a formidable extent.

MNREGA Participation

Women participation under the scheme has been depicted in Table-2. With a view to getting a wider and in-depth scenario the study has assessed an average participation of the sample women for last three years under MNREGA instead of only one year.

Table-2 : Average MNREGA Work-days enjoyed by the Women in Last Three Years

Days of Employment	Nil	1-15	16-30	31-60	61-90	91-99	100	Total
%	0.2	9.2	21.6	48.2	12	8.2	0.6	100

Source : Survey data

Considering the aggregate data it can be stated that around 68.4 percent women in the sample have enjoyed on average 31-100 days of job under the scheme during the last three years. It

implies that rest 31.6 percent i.e almost 1/3rd of the women in the sample have got only 0- 30 days of employment under the scheme during the period. However number of women enjoyed 100 days of employment has pegged at only three. They are the workers in Sarati Panchayet of Chakdaha Block entrusted with ICDS job in terms of cleaning and sweeping of the local school campus for the last three years.

Awareness Indicator

In general there are five components in the empowerment process namely, welfare, access, awareness, participation and control (Parvin 2012, p. 187). In the study awareness measures the level to which the women are abreast of the scheme. Awareness is a very important component in the process of empowerment. To what extent a woman is aware of the situation around is very crucial for her much sought empowerment. In previous studies also emphasis has been given on awareness of the women on the scheme (Jandu, 2008), (Pankaj & Tankha, 2010). In this study the question of awareness has been made limited to women's awareness about their entitlement in regard to MNREGA. During survey women were made confronted with 15 questions in order to judge their level of awareness on three heads relating to the scheme namely, awareness on gram sabha etc., awareness on MNREGA features and awareness on MNREGA worksite facilities. Table-3 exhibits the response of the women workers under study regarding their awareness on three heads as well as total awareness about the scheme which is nothing but the addition of the responses on the three parameters. In all cases the awareness level of the workers has been sub-divided in three point scale.

Table 3: Workers' Response regarding Awareness

Blocks	Gram Panchayets	Awareness on Gram Sabha etc.			Awareness on MNREGA Features			Awareness on MNREGA Worksite			Total Awareness		
		3 Questions	2 Questions	0 to 1 Question	5 to 7 Questions	3 to 4 Questions	1 to 2 Questions	All 5 known	3 to 4 known	1 to 2 known	11 to 15 Questions or 67% to 100%	6 to 10 Questions or 34% to 67%	1 to 5 Questions or 0% to 33%
Chakdaha	Hingnara	**13**	**29**	**30**	**1**	**11**	**60**	**0**	**30**	**42**	**5**	**32**	**35**
		18.1	40.3	41.7	1.4	15.3	83.3	0	41.7	58.3	6.9	44.4	48.7
	Sarati	**20**	**14**	**9**	**5**	**22**	**16**	**0**	**43**	**0**	**6**	**21**	**16**
		46.5	32.6	20.9	11.6	51.2	37.2	0	100		14	48.8	37.2

Krishnaganj	Bhajanghat Tungi	**37**	**24**	**38**	**10**	**40**	**49**	**0**	**69**	**30**	**35**	**36**	**28**
		37.4	24.2	38.4	10.1	40.4	49.5	0	69.7	30.3	35.4	36.4	28.2
	Taldah Majdia	**2**	**12**	**18**	**0**	**0**	**32**	**0**	**0**	**32**	**0**	**2**	**30**
		6.2	37.5	56.3	0	0	100	0	0	100	0	6.2	93.8
Nakasipara	Birpur-II	**0**	**0**	**60**	**0**	**3**	**57**	**0**	**0**	**60**	**0**	**3**	**57**
		0	0	100	0	5	95	0	0	100	0	5	95
	Patikabari	**33**	**29**	**2**	**4**	**57**	**3**	**0**	**64**	**0**	**33**	**31**	**0**
		51.6	45.3	3.1	6.2	89.1	4.7	0	100		51.6	48.4	0
Santipur	Belgoria-I	**6**	**18**	**9**	**0**	**7**	**26**	**0**	**0**	**33**	**0**	**8**	**25**
		18.2	54.5	27.3	0	21.2	78.8	0	0	100	0	24.2	75.8
	Fulia Township	**29**	**53**	**15**	**11**	**86**	**0**	**72**	**0**	**25**	**40**	**41**	**16**
		29.9	54.6	15.5	11.3	88.7	0	74	0	25.8	41.2	42.3	16.5
Total	Number	**140**	**179**	**181**	**31**	**226**	**243**	**72**	**206**	**222**	**119**	**174**	**207**
	%	**28**	**35.8**	**36.2**	**6.2**	**45.2**	**48.6**	**14**	**41.2**	**44.4**	**23.8**	**34.8**	**41.4**

Note : In the cell upper figures indicate frequencies and lower figures indicate percentage
Source : Primary data

It reveals that 28 percent workers are aware of the all the three questions on gram sabha etc. which is in sheer contradiction with the gram sabha participation. The study reflects that 64.6 percent workers have replied to participate in gram sabha but less than half of them know about it. So, most of the workers participate in gram sabha just to register their name in the meeting lest their chance to get the employment under the scheme gets lapse. The workers of Sarati and Parikabari panchayats have revealed to have higher awareness on this head. Workers awareness on the other two heads looks grimmer as compared to the first one. Only 6.2 percent women have been aware of the five to seven questions, the highest level of awareness set in this category. As per the Act the workers specifically the women workers are entitled to enjoy five types of facilities in the worksite but excepting workers of Fulia Township panchayat no other workers are abreast of this dimension of the scheme. The survey was done in the year 2016-17 on 2015-16 data. So, after the end of tenth year of implementation of the scheme, this sort of awareness about the scheme simply presents a bleak picture of the indicator.

Analysis of Awareness

In the analytical part, the study mostly dwells on Factor Analysis in order to assess whether the indicators chosen for assessing empowerment of women under the scheme are justified or not. Generally Factor Analysis justifies the appropriateness of the factors chosen for a said purpose.

The results of Factor Analysis on awareness dimension of empowerment have been presented in Table-4 and Table-5. In order to check the appropriateness of sample adequacy the useful statistics Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) has been measured. In general KMO

measure is an index used to assess the sample adequacy of a factor analysis (Mandal , Bandyopadhyay & Roy, 2011, p. 31). Its value between 0.5 & 1 indicates that factor analysis is adequate in terms of sample (Malhotra, 2009 as cited in Mandal et al, p. 31). In the case of awareness the value of KMO measure of sample adequacy is 0.677 which signifies the purpose of adequacy.

Table 4: KMO and Bartlett's Test for Awareness

Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy	0.677
Bartlett's Test of Sphericity Approx. Chi-Square	455.117
df	3
Sig.	<0.001
Source: Primary data	

On the other hand, Bartlett's test of sphericity is done to assess whether the appropriate inter correlation exists for running factor analysis or not (Mandal et al, p. 31). The higher the value of test statistic, factor model becomes more appropriate. In this case the approximate Chi-square value is 455.117 which is significant at <0.001 level. Hence the null hypothesis of spherical matrix is rejected and non spherical correlation matrix confirms the presence of inter-correlation among the items of the factor (Ghosh, Roy, Bandyopadhyay, & Choudhuri, n.d., p. 189). So all these facts allow us to use factor analysis in this present analysis.

Table 5: Result of Factor Analysis

Variables	Factor Loadings	Eigen value	Variance Explained	Reliability (Cronbach's Alpha)
Awareness on Gram Sabha etc	0.843	2.10	70.08	0.775
Awareness on MNREGA Features	0.880			
Awareness on MNREGA				
Worksite Facilities	0.786			
Extraction Method: Principal Component Analysis				
1 component extracted				
Source: Primary data				

Now using the Principal Component Analysis the minimum number of factors are determined that will account for maximum variance in the sample for all those Eigen Values having scores greater than 1. Eigen Value is the latent root indicating the relative importance of each factor in accounting for the particular set of variables being analysed (Kothari, 2004, p. 323). Now each factor is composed of variable or item which is having factor loading. Factor loading expresses the correlation between the variables and the factor. The magnitude of the

factor loading indicates the extent to which a particular merit rating item is associated with the factor in question. It is justified to use items having loadings over 0.50 (Dwivedi, 1997, p. 201).

In the case of awareness indicator 01 component has been extracted having the Eigen value of 2.10 explaining the 70.08 percent of the variance. With the help of factor analysis it can be identified whether a single latent trait or construct underlies the items on a scale or multiple traits are there leading to unidimensionality or multidimensionality of the sample of items (Tavakol& Dennick, 2011, pp. 53-54). Here a single latent trait underlies the items. So, it is unidimensional.

All of the items in question have factor loadings over 0.50 with the variable "Awareness on MNREGA Features" having the highest loading of 0.880. The table also contains the value of Cronbach's alpha. Generally alpha is a measure used to assess the reliability, or internal consistency, of a set of scale or test items. Alpha coefficients that are less than 0.5 are usually not acceptable (Goforth, 2015). Therefore, the value of Alpha here also signifies the reliability of the scale.

Table 6: Female 03-Year Average Participation vs Level of Awareness

Female 03-year average participation		**Awareness Level**			
		67-100%	34-66%	1-33%	Total
0-15	Count	**0**	**7**	**40**	**47**
	% within 3-yr partn	0	14.9	85.1	100
	% within awareness	0	4	19.3	9.4
16-30	Count	**0**	**32**	**76**	**241**
	% within 3-yr partn	0	29.6	70.4	100
	% within awareness	0	18.4	36.7	48.2
31-60	Count	**57**	**99**	**85**	**241**
	% within 3-yr partn	23.7	41.1	35.3	100
	% within awareness	47.9	56.9	41.1	48.2
61-90	Count	**38**	**17**	**5**	**60**
	% within 3-yr partn	63.3	28.3	8.3	100
	% within awareness	31.9	9.8	2.4	12
91-100	Count	**24**	**19**	**1**	**44**
	% within 3-yr partn	54.5	43.2	2.3	100
	% within awareness	20.2	10.9	0.5	8.8
Total	Count	**119**	**174**	**207**	**500**
	% within 3-yr partn	**23.8**	**34.8**	**41.4**	**100**
	% within awareness	**100**	**10**	**100**	**100**

Source : Primary data

All these results allow us to go further for finding out the interdependence between level of awareness with that of MNREGA participation of the women workers in our sample. Apparently it seems that level of awareness about the scheme depends on the participation rate of the workers under the scheme. Besides, literacy level of the workers also plays a vital role in generating awareness (Pankaj & Tankha, 2010, p. 52). However for the time being we have been interested in finding out the only relation between overall awareness with MNREGA participation. Hence cross tabulation along with Chi-square test are done the results of which are presented in the Table-6 and the Table-7.

Table 7: Results of Chi-Square Test

Variables	χ^2	Sig.
Total Awareness	182.175	<0.001

Source: Primary Data

It reveals from the Table-6 that there are 207 numbers of workers who fall in the level awareness of 1-33%. Now, out of them, 116 women (56.04%) have enjoyed only 0-30 days and another 41.06 percent women have got 31-60 days of employment under the scheme during last three years. On the other hand, there are 104 numbers of women who have got 61-100 days of work during the period out of which 62 women (59.62%) have 67-100% level of awareness and another 36 women (34.62%) have 34-66% level of awareness. So, it clearly depicts that participation under MNREGA and level of awareness about the scheme is positively correlated. The significant value of Chi-square also endorses the inter-relation between the two variables total awareness and MNREGA participation.

Conclusion

Awareness measures the extent to which the women are abreast of the situation around which is indicative for their much sought empowerment. In the question of awareness, the focus has been pointed to women's awareness about their entitlement in regard to the scheme. Superficially, the level of awareness shows a positive relation with participation rate of the workers under the scheme; the more they participate in the scheme the more they are acquainted with it. However, categorical assessment on this account leaves not so satisfactory results. Majority of the workers are abreast of neither the features of the scheme nor their entitlements in regard to worksite facilities. At the end of tenth year of the scheme in execution, this sort of awareness about the scheme simply presents a sorry state of the indicator.

References :

Dwiedi, D. S.(1997). Research methods in behavioural sciences. Macmillan India Ltd.

Ghosh. A, Roy. S, Bandyopadhyay. G, and Choudhuri, K. (n.d) Determinants of BSE sensex: A factor analysis approach. Retrieved from https://docuri.com/download/gb-sir_59c1e399f581710b286ac2cb_pdf on 12.04.16

Goforth, C. (2015). Using and interpreting Cronbach's alpha. Retrieved from http://

data.library.virginia.edu/using-and-interpreting-cronbachs-alpha on 20.07.2017

Jandu, N. (2008). Employment guarantee and women empowerment in rural India. Retrieved from www.righttoffodindia.ord on 30.06.2014

Kothari, C. R. (2004). Research methodology methods & techniques. New Delhi: New Age International Publishers.

Liu, Y., & Deininger, K. (2010). Poverty impact of India's national rural employment guarantee scheme: Evidence from Andhra Pradesh. Retrieved from https://ageconsearch.umn.edu/bitstream/62185/2/Paper_NREGA.pdf on 08.08.2016

Malla, M.A. (2014). NREGA in Kashmir-opportunity for social protection derailed. Economic and Political Weekly, 49(52), 109-114.

Mandal, K., Bandyopadhaya, G., & Roy, K. (2011). Quest for different strategic dimensions of channel management: An empirical study. Journal of Business Studies Quarterly, 3(2), 25-44. Retrieved from http://jbsq.org/wp-content/uploads/2011/12/Dec_2011_3.pdf on 13.05.16

Pankaj, A., & Tankha, R. (2010). Empowerment effects of the NREGS on women workers: A study in four states. Economic and Political Weekly, 45(30), 45-55.

Parvin, M. R. (2012). Empowerment of women- strategies & systems for gender justice. New Delhi: Dominant Publishers & Distributors Pvt. Ltd.

Planning Commission, Government of India. (2014). Report of the expert group to review the methodology for measurement of poverty. Retrieved from http://planningcommission.nic.in/reports/genrep/pov_rep0707.pdf on 02.03.16

Shashi Kumar, R. (2008). Women empowerment in India: Deficiencies, imbalances and required changes. In V. S. Ganesahmurthy (Ed.) Empowerment of women in India-Social, economic and political (pp. 1-30). New Delhi: New Central Publications.

Sinha, P. (2011). Contribution of NREGA to the reduction of poverty in Bihar, India. Lambert Academic Publishing.

Tavakol. M., & Dennick, R. (2011). Making sense of Cronbach's alpha. International Journal of Medical Education. 2:53-55. Retrieved from https://www.ijme.net/archive/2/cronbachs-alpha.pdf on 20.07.17

Arindam Chakraborty
Associate Professor of Economics
Dept of Commerce
S. R. Lahiri Mahavidyalaya

ISSN: 2249-4332

Information to the Contributors

1. The length of the article should not normally exceed 5000 words.
2. Two copies of the article on one side of the A4 size paper with an abstract within 150 words and also a C.D. containing the paper in MS-Word should be sent to the Editor or by e-mails.
3. The first page of the article should contain title of the article, name(s) of the author(s) and professional affiliation(s).
4. The tables should preferably be of such size that they can be composed within one page area of the journal. They should be consecutively numbered using numerals on the top and appropriately titled. The sources and explanatory notes (if any) should be given below the table.
5. Notes and references should be numbered consecutively. They should be placed at the end of the article, and not as footnotes. A reference list should appear after the list of notes.
   It should contain all the articles, books, reports are referred in the text and they should be arranged alphabetically by the names of authors or institutions associated with those works. Quotations must be carefully checked and citations in the text must read thus (*Coser 1967, p. 15*) or (*Ahluwalia 1990*) and the reference list should look like this :
   1. Ahluwalia, I. J. (1990), 'Productivity Trend in Indian History : Concern for the Nineties', Productivity, Vol. 31, No. pp 1-7.
   2. Coser, Lewis A (1967), 'Political Sociology', Herper, New York.
6. Book reviews and review articles will be accepted only for an accompanied by one copy of the books reviewed.
7. The author(s) alone will remain responsible for the views expressed by them and also for any violation of the provisions of the Copy Rights Act and the Rules made there under in their articles.

Our Ethics Policy : It is our stated policy to not to take any fees or charges in any forms from the contributors of articles in the Journal. Articles are published purely on the basis of recommendation of the reviewers.

For Contribution of Articles and Collections of copies and for any other Communication please contact

Executive Editors

OPEN EYES

S.R.Lahiri Mahavidyalya ,
Majdia , Nadia-741507, West Bengal, India,
Phone-03472-276206.
bhabesh70@rediffmail.com, shubhaiyu007@gmail.com,
srlmahavidyalaya@rediffmail.com
Please visit us at : www.srlm.org

OPEN EYES

Indian Journal of Social Science, Literature, Commerce & Allied Areas

Volume 16, No. 1, June 2019

Published by Dr. Sarojendra Nath Kar, Principal,
S.R.L. Mahavidyalaya, Majdia, Nadia, West Bengal, India.
Printed by :

Price : One hundred fifty only